সেবকের নিবেদন।

অর্থাৎ

শ্রীনববিধানাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের

উপদেশ।

[পঞ্চম খণ্ড।]

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটি দ্বারা প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮০৭। অগ্রহায়ণ।

সূচী পত্র।

বিষয়।			পৃষ্ঠা।
ভাই অঘোরনাথ	...	...	১
সৎসঙ্গ	...	...	৯
কর্ম্ম-যোগ	...	...	১৬
রাজা রামমোহন রায়	...	...	২৩
সাধু সম্মান	...	...	৩১
অভ্রান্তবাদ	...	...	৩৭
ব্রহ্মোপাসনা	...	...	৪৪
দুর্ব্বোধ্য নববিধান	...	...	৫২
বিজয়নিশান	...	...	৫৮
ঈশ্বরের সখাভাব	...	...	৬৩
নববিধানের বিজয় নিশান	...	...	৭৫
প্রেমের গূঢ় তত্ত্ব	...	...	৮০
স্নান ও ভোজন	...	...	৮৫
মুক্ত অবস্থা	...	...	৯৭
প্রত্যাদেশ	...	...	১০৪
নববিধানে কৈলাস আবিষ্কার	...	...	১১১
সতীত্ব	...	...	১১৮
পূর্ণধর্ম্ম ভবিষ্যতে	...	...	১৩১

সেবকের নিবেদন

ভাই অঘোর নাথ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার, ২০ শে অগ্রহায়ণ, ১৮০৩।

ঈশ্বরের ইচ্ছা হইল পৃথিবীকে পরিত্রাণ করিবেন। যেমন ইচ্ছা হইল, অমনি এক মূর্ত্তি সাদা এক মূর্ত্তি কাল দেখা দিল। ঈশ্বর গভীর নিনাদে বলিলেন, আমি সাদা ও কালকে ভেদ করিব এবং এই দুটিকে জীবের স্বর্গ-গমনের দুই পথ করিব। অমনি দুই পথ তৎক্ষণাৎ পৃথিবী মধ্যে প্রমুক্ত হইল। একটি সূর্য্যের ন্যায় সাদা, আর একটি কাল ঘোর অন্ধকার। যেমন ঈশ্বর বলিলেন, পৃথিবী, অদ্য হইতে সাদা ও কালর মধ্য দিয়া তোমাকে গমন করিতে হইবে, অমনি সমুদায় জীব সেই সাদা ও কালর মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং তাহার মধ্যে ক্রীড়া করিতে লাগিল। ঈশ্বরের প্রেম হইতে জগতে দুই বস্তু উৎপন্ন হইল, এক লোভ আর এক ভয়; এক সুখ আর এক দুঃখ। ভাবিও না, ব্রহ্মসাধক, ইহার একটির সমাদর করিবে, অপরটিকে ঘৃণা করিবে। অন্ধকার দেখিয়া ভীত হইও না। নব-বিধান আলোককেও প্রণাম করেন, অন্ধকারকেও প্রণাম করেন। সাদা রংও তোমার পূজনীয়, কাল রংও তোমার স্তবনীয়। কাল ভাল বই কখন মন্দ নয়। অর্দ্ধভাগ জ্যোতি, অপরার্দ্ধভাগ অন্ধকার। যেমন দেবীর পূজা করিবে তেমনি কালীরও পূজা করিবে। এক দিকে জীবন ক্রীড়া করিতেছে, আর এক দিকে মৃত্যু খেলা করিতেছে। যখন আমাদিগের ঈশ্বর জীবের পরিত্রাণের জন্য এই দুই বিরুদ্ধ ভাব উৎপন্ন করিলেন, তখন বাহ্যিক রোগ শোক, সুখ দুঃখ, মৃত্যু জীবন দেখিয়া ইহাদিগকে প্রভেদ

করিতে পার না। আমরা একান্ত মূর্খ নই, অবিশ্বাসী নাস্তিক নই যে অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করিব, অপরার্দ্ধ পরিত্যাগ করিব। মৃত্যুকে দেখিয়া মূর্খেরাই বিকম্পিত হয়, ভীত হয়। কিন্তু ভয়ানক মৃত্যুই পরিত্রাণের সেতু। ঈশ্বরের সুন্দর মুখ দেখিলে লোভ হয়, অন্ধকার মৃত্যু দেখিলে লোকে ভয় পায়, কিন্তু অন্ধকার আমাদিগের পরম উপকারী। বালক অন্ধকার দেখিলে ভীত হয়, কিন্তু ভীত শিশু মার ক্রোড় আরো আঁকড়াইয়া ধরে। আলো থাকিলে শিশু যে সুন্দর বস্তু দেখিতে পায় তাহা লইয়া ব্যস্ত থাকে, কিন্তু অন্ধকার আসিলে, আলোক হরণ করিলে, আলোক নাই দেখিয়া শিশু মা মা বলিয়া বাহির হইতে দৌড়িয়া মার নিকটে আসে, দুই কোমল হস্তে মার স্তন ধারণ করিয়া কেবল মা মা বলিতে থাকে। শিশুর মা মা বলাতেই সুখ। এ সুখের কারণ ভয়। ভয়ে মার কোলে গিয়া সে আর অন্য নাম করে না; জননীর স্তনের দুগ্ধ ভিন্ন অন্য কিছু চায় না। দয়াময় পৃথিবীর লোককে ভীত করেন। তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিবার জীবন এক দ্বার, মৃত্যু আর এক দ্বার। এক দিক হইতে ভয় তাড়াইয়া মৃত্যুর দ্বারে প্রবিষ্ট করে, আর এক দিক হইতে লোভ জীবনের দ্বারে তাড়াইয়া আনে। দুঃখ আক্রমণ করিলে আমরা ঈশ্বরকেই অন্বেষণ করি, সুখ লাভ করিলে আমরা ঈশ্বরকেই ডাকি। মৃত্যুভয় ভীত করে বলিয়া আমরা অভিযোগ করিতে পারি না। ব্রহ্মোপাসনার আলোকে আমরা অন্ধকারের ভিতর ব্রহ্মপুরী অবলোকন করিব। অন্ধকারে দেবদর্শন ব্রহ্মসমাধির এই তত্ত্ব। খুব ভয় হয় আর সাধকের পূর্ণ যোগ হয়। দুঃখ পাইয়া মানুষ যোগী হয়, মানহানি ধনহানি সন্তানহানি হইলে আরো যোগী হয়। টাকা আসিল বন্ধু পাইলাম, সুখের পরিসীমা রহিল না, তাহাতেও ঈশ্বরকে পাইলাম। এক হাতে সুখ এক হাতে দুঃখ ধারণ করিব। সুখ দুঃখ দুই মার কাছে লইয়া যায়। দক্ষিণ হস্ত ধরিল জীবন ও সুখ, মৃত্যু ও শোক বামহস্ত ধরিল। ইহারা টানিয়া মার কাছে লইয়া চলিল। এক হস্ত উৎসুক হইয়া সুখের বস্তু ধরিল, আর এক হাত রোগ শোক কলহ বিবাদ প্রভৃতি পৃথিবীর দুঃখ ধরিল। দীনতার কর ধরিয়াও মার নিকটে যাইবে, ধনের কর ধরিয়াও মার নিকটে যাইবে। সুখে আমোদিত হইয়াও মাকে মনে পড়ে, দুঃখে কাঁদিতে

কাঁদিতেও মাকে মনে পড়ে। আমাদের হৃদয়ের ভাই অন্ধকার করিয়া হঠাৎ অকালে পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন। সাধু তিনি, তিনি চলিলেন। হঠাৎ দুর্ঘটনা আসিয়া ঘটিল ইহা আমরা বলিব না এ কথা আমরা কখন মুখে আনিব না। বন্ধুবিয়োগ বন্ধুবিচ্ছেদ গভীর ঘটনা। ঘটনার পর ঘটনা চলিয়া যাইতেছে আমরা কি কেবল সাগরের ধারে বসিয়া ঢেউ গণনা করিব? বন্ধুর মৃত্যু হইল বলিয়া কি আমরা এমত ভাবে কান্দিব যে কান্দিতে কান্দিতে ভাবিতে ভাবিতে অবসন্ন হইয়া পড়িব? আমাদের বন্ধুকে কে বক্ষ হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া গেল এই বলিয়া কি কান্দিব? পাঁচটি ভাই আমরা ছিলাম, যম আসিয়া তাহার একটিকে চুরী করিয়া লইয়া গেল, যাঁহার শরীর সুস্থ, নবীন যৌবন; যিনি অত্যন্ত প্রতাপ ও মহিমা সহ কার্য্যক্ষেত্রে পদার্পণ করিয়া প্রেরিতজীবন দ্বারা বলপূর্ব্বক সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ দুঃখিত ব্রাহ্মমণ্ডলী শোক করিতেছে, দুঃখিনী বিধবা ও নিরাশ্রয় সন্তান সন্ততি কাঙ্গালের ন্যায় কাঁদিতেছে। "হায় হায়" শব্দ পড়িল, কেবল রোদনের ধ্বনি, চারিদিক্ অন্ধকারময়। এখন শোকে সকলকে নিমগ্ন করিয়া ঈশ্বর কি অবিচার করিলেন? এমন বন্ধু আমরা হারাইলাম। ঈশ্বর কি এত অবিচার করিতে পারেন? বাছিয়া বাছিয়া সাধু অঘোরকে টানিয়া উপরে লইয়া গেলেন। এ কেমন কথা? এই কি তাঁহার মনে ছিল যে পরিবার বন্ধুবান্ধব সকল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অকালে অঘোরের জীবন হরণ করিবেন, ভক্তমণ্ডলীর মস্তকের মুকুট কাড়িয়া লইবেন? তিনি স্ত্রীকে এত শীঘ্র বৈধব্যদুঃখে নিঃক্ষেপ করিলেন, সন্তানসন্ততিগণকে পিতৃহীন করিলেন, এতই কি তাঁহার অবিচার? তাঁহার প্রাণের মধ্যে কি এত নিদারুণ অবিচারের ভাব উদিত হইবে? তাঁহাতে কি আমরা 'নিষ্ঠুর' শব্দ প্রয়োগ করিব? আমাদের বিশ্বাস হয় না আমাদের যিনি আনন্দময়ী মাতা, প্রেমময়ী যাঁহার নাম, তিনি কখন নিষ্ঠুর হইতে পারেন, তিনি কখন স্বর্গের সিংহাসনে বসিয়া অবিচার করিতে পারেন। আমাদের মা মঙ্গলময়ী, আমরা সর্ব্বত্র মঙ্গল অন্বেষণ করি, আমারা যে আমাদিগের মাকে ভাল বাসি। এই গুরুতর ঘটনা কেন হইল আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মমন্দিরের নিকট অমঙ্গল নাই, বুঝিতে হইবে

বন্ধু কেন গেলেন? বিদেশে লক্ষ্ণৌনগরীতে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন, আর দেশে ফিরিয়া আসিলেন না। দেশে আসিয়া তাঁহার মনের কথা কাহারও নিকটে বলিতে পারিলেন না। আর পৃথিবীতে কেহ তাঁহাকে দেখিবে না। ১১ই মাঘের উৎসব আসিতেছে, আর উৎসব করিবার জন্য তিনি ফিরিয়া আসিবেন না। সকলেই উৎসবে আসিবেন. আমরা কেবল তাঁহাকেই তাঁহাদিগের মধ্যে দেখিতে পাইব না। আর তাঁহাকে পৃথিবীতে কাছে বসাইব না। আর সেই ভাইয়ের সঙ্গে একত্র বসিয়া এখানে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিব না। আর তাঁহার সঙ্গে পৃথিবীর সম্বন্ধ রহিল না। সকলের স্থান ও আসন পূর্ণ, কেবল অঘোরের স্থান ও আসন খালি থাকিল। হায়, ব্রাহ্মসমাজ এই প্রথম নিদারুণ শোকের সংবাদ শুনিল। ভ্রাতৃবিয়োগ কি এত দিনে বুঝা গেল। এমন মনে ছিল না যে অঘোর আমাদিগকে এত শীঘ্র ছাড়িয়া যাইবে। আমরা এ বিষয় কিছু মাত্র তো প্রস্তুত ছিলাম না। ভ্রাতৃবিচ্ছেদের দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা আসিয়া হঠাৎ আঘাত করিল। এ সকল দুঃখের কথা লইয়া বন্ধুর সঙ্গে যে আলাপ করিব তাহারও উপায় নাই। যাউক, এ সকল দুঃখের কথা তো সংসারের কথা। দুঃখের কথা বলিয়া ফল কি? মার নামকে তো নিরপরাধ রাখিতে হইবে, এই চিন্তাই এখন প্রবল। এরূপ ব্যাপারতো অকস্মাৎ ঘটে না। আমরা শোকের গরল পান করিয়া আত্মাকে নাস্তিক করিব না। ইহার মধ্যে ঈশ্বরের অভিপ্রায় আছে, শোক পরিত্যাগ কর, স্থির হও, কান্দিও না। সকলকে দুঃখী করিয়া ভাই কোথায় গেলেন জান? ভাবিয়া দেখ. এক জন আগে না গেলে সেখানকার ঘর পরিষ্কার করিবে কে? অবশেষে তোমাদিগের সকলকে যাইতে হইবে। তোমাদিগের যাইবার পূর্ব্বে এক জন জানা শুনা লোকের যাওয়া অসঙ্গত নহে। আমাদিগের মধ্যে এক জন আয়োজন করিবার জন্য অগ্রে গেলেন। কেমন লোক গেলেন? যিনি যোগ ধর্ম্ম সাধন করিয়াছিলেন। নির্জ্জনে যোগধর্ম্ম সাধন করিতে প্রিয় অঘোর যেমন জানিতেন তুমি আমি তেমন জানি না। তাঁহার জীবন যোগপ্রধান ছিল, কিন্তু মধুর ভক্তির পথই তাঁহার মতন আর কে জানে? তাঁহার মতন কে আর আমাদিগের মধ্যে স্বর্গে অগ্রগামী হইবার উপযুক্ত? প্রাচীন

ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে, মহর্ষি ঈশা মৃত্যুর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, আমি পিতার বাড়ী যাইতেছি, তোমাদিগের সকলের জন্য বাড়ী প্রস্তুত করিয়া রাখিব। আমাদিগের অগ্রগামী সাধু হরিনাম করিতে করিতে দৌড়িয়া মার নিকটে গেলেন। গিয়া বলিলেন, "মা, আমি আমার পৃথিবীর কার্য্য করিয়া আসিলাম। আমি আসিলাম, আরো তোমার সন্তানেরা আসিতেছে, তাহাদিগের জন্য অমৃতপাত্র প্রস্তুত কর। কলস কলস অমৃত রাখিয়া দাও। তাহারা ভারি অমৃতপ্রিয়, তাহাদিগের অল্পে হয় না। ১১ ই মাঘ আসিতেছে, তুমি জান মা তাহারা উৎসবে কেমন মাতে। ঐ ঘরে দলে দলে সহস্র সহস্র লোক আসিয়া যাহাতে বাস করিতে পারে তেমন করিতে হইবে। লোকগুলি আর কাহাকেও চায় না কেবল তোমাকেই চায়। তাহারা তোমা ছাড়া মধ্যবর্ত্তী চায় না, তারা দুটি বেলা তোমার নাম কীর্ত্তন করে। তোমার ছেলেগুলি কলিকাতায় ভারি কীর্ত্তন করে।" অঘোরের সোজা সোজা ছেলে মানুষের কথা এখনও আমাদের স্মরণ আছে। সেই প্রকার সুমিষ্ট কথায় সে মাকে সকল কথা বলিতেছে। অগ্রগামী ভাই সেখানে গিয়া আমাদিগের জন্য ঘর প্রস্তুত করিয়ার সমুদায় যোগাড় করিতেছেন। যাঁহারা এখানে আছেন, তাঁহারা সেখানে গিয়া বাস করিবেন। পিতার নিকটে বলিয়া তিনি সুখের সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিবেন। তাঁহার সমুদায় দেখা রহিল। আমাদিগকে যখন যাইতে হইবে তখন তিনি সেখান হইতে আসিয়া আমাদিগকে লইয়া যাইবেন। তিনি দেখিয়া শুনিয়া গিয়াছেন, তিনি পথ চিনিয়াছেন, তিনি সেখান হইতে আবার আমাদিগের মধ্যে আসিবেন, আসিয়াছেন। স্বর্গে যে সকল অশরীরী আত্মা আছেন, তাঁহাদিগের সঙ্গে বসিয়া তিনি তাঁহাদিগের ভ্রাতা হইয়াছেন। আর আমরা তাঁহার হাত ধরিতে পারিব না, এখানে তাঁহার সঙ্গে সুখে আলাপ করিবার সম্ভাবনা নাই, আর তিনি আমাদিগের বক্তৃতা উপাসনার সঙ্গী হইবেন না, এ সমুদায় ঠিক। কিন্তু ইহা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে আমাদিগের অন্তরের যোগ জন্মেও শেষ হইবার নহে। তাঁহার শরীর ছিল, এখন তিনি অশরীরী হইয়াছেন, কিন্তু সেই ভালবাসা আছে। সেই অঘোর আজও আমাদিগের বক্ষে আছেন। বাহিরে যে বন্ধু ছিলেন, ঘরে

যে বন্ধুকে আমরা দেখিতাম, সেই বাহিরের বন্ধু বুকের ভিতরে আসিলেন, সেখানে চিরস্থায়ী হইলেন, শরীরহীন আত্মা প্রাণের ভিতরে আশ্রম করিলেন। এখান হইতে স্বর্গে পত্র পাঠাইতে হইলে, স্বর্গের পথ চেনা আছে, অঘোর স্বর্গে চিঠী পঁহুছাইয়া দিবেন। ভাইয়ের ভিতর দিয়া, তাঁহার চরিত্র স্বভাবের ভিতর দিয়া, আমাদিগের আবেদন স্বর্গে পঁহুছিবে। সে লোকটির চরিত্র আমাদিগেব সমুদায় কথা বহন করিবে। এ সুন্দর চরিত্র ছবি নয়, কল্পনা নয়, ইহা যথার্থ এবং স্থায়ী। ইহা সময়ে লীন হয় না, শরীরের সঙ্গে ধ্বংস হয় না। তিনি এখনও আমাদিগের বুকে চরিত্ররূপে নিবিষ্ট। তিনি পৃথিবীতে যোগ শিক্ষা করিতেন। হিমালয়, তিনি তোমার মুসুরী মরী পর্ব্বতকে আবাস স্থান করিয়া ছিলেন, তিনি তোমার অতি প্রিয় বন্ধু ছিলেন। হিমালয়, একালে অঘোর যেমন তোমর বন্ধু, তেমন বন্ধু বোধ হয় আর আধুনিকদিগের মধ্যে কেহ নাই। সোমবার মঙ্গলবার বুধবার সমুদায় সপ্তাহ ভাই অঘোর হিমালয়ের বুকের ভিতরে গর্ত্তের মধ্যে, যেখানে মনুষ্যের চক্ষু কর্ণ যায় না, সেখানে যোগ ধ্যানে সময় কাটাইতেন। নিভৃত হিমালয়ে প্রশান্ত ভাবে ঈশ্বরেতে তিনি নিমগ্ন থাকিতেন। আজও দেখিতেছি আমার জ্যেষ্ঠ আমার পিতা অঘোর সেখানে বসিয়া আছেন। বর্ত্তমান কালের ঋষিজীবন তাঁহারই। টাকার আকর্ষণ পৃথিবীর পরিবার বন্ধুবান্ধবের আকর্ষণ তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া রাখে নাই। বাজারে খুঁজিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না, তাঁহাকে দেখ গিয়া হিমালয়ের ক্রোড়ে মরী পর্ব্বতে। খুঁজিতে হইলে তাঁহাকে সেই সকল স্থানে খুঁজিতে হইবে। সেখানে তিনি ঠিক ঋষির ন্যায় ধ্যানস্থ হইয়া বসিতেন। চক্ষু নিমীলিতি, প্রশান্ত মুখমণ্ডল, স্থির আসন, ঋষিসম গাম্ভীর্য্য, এ দিকে শিশুর ন্যায় সরল বিনীত ঈশ্বরের পদানত। তখনি তাঁহার শরীর ছিল না, তিনি তখনি মরিয়াছিলেন। এ মৃত্যুর অনেক দিন আগে তিনি শরীরমুক্ত হইয়াছিলেন, ঈশ্বরে আনন্দ সম্ভোগ করিতেন। বাহ্য শরীর ছিল বটে কিন্তু তিনি পৃথিবীতে বিচরণ করিতেন না। নিয়ত হিমালয় কৈলাসে ভ্রমণ করিতেন। এত নির্জ্জনপ্রিয় আর কে আছে, আমাদের মধ্যে মাকে কেইবা এত ভাল বাসে? তিনি তাঁহার চিরসখাকে চিনিয়াছিলেন। শরীর ছাড়িয়া

যাইতে হইবে এ জন্য, শীঘ্র শীঘ্র তিনি দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শীঘ্র স্বর্গে যাইবার সম্বল করিবার জন্যই তিনি বস্তু সামগ্রীর আয়োজন উদ্দেশে হিমালয়ে গিয়াছিলেন। অঘোর, তুমি ঋষি, নব বিধান তোমাকে ঋষি বলিয়া সম্বোধন করিবে। অঘোর কি কেবল পাহাড়েই থাকিত? যখন কীর্ত্তন হইত, অঘোর তাহার সর্ব্বাগ্রে যাইত। পাশে দাঁড়াইয়া যখন সে কর্ত্তাল বাজাইত, তখন কি অপূর্ব্ব শ্রী প্রকাশ পাইত। অঘোর কাঁদিত, হরি হরি বলিয়া সে মুগ্ধ হইত, কিন্তু কখন তাহার চৈতন্য যায় নাই। তাহার হাতে আমরা ভিক্ষার ঝুলি দিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, ভাই তুমি পয়সা জড় কর। প্রচার যাত্রার খরচ তিনিই সংগ্রহ করিতেন। হরিসঙ্কীর্ত্তনে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। হরির প্রিয় তিনি সাধু ভক্ত। যে ধ্রুব প্রহ্লাদের বহিখানি তিনি লিখিয়াছেন, তিনি পৃথিবীতে নিজেই সেই ধ্রুব প্রহ্লাদ ছিলেন। ছেলে মনুষের মতন তিনি, এই ছেলে দুটির সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল, তিনি বুকের ভিতরে তাঁহাদিগের সঙ্গে কথোপকথন করিতেন। সেই আদর্শে তাঁহার চরিত্র সংগঠিত হইয়াছিল। এজন্য তিনি ভক্ত ছিলেন, আমাদিগের মধ্যে ভক্তশ্রেষ্ঠ ছিলেন। সর্ব্বদা তিনি হরির সঙ্গে থাকিতেন। পঞ্জাবে তাঁহাকে এই বেদী হইতে প্রেরণ করা গিয়াছিল। পঞ্জাবে হরিকীর্ত্তন করিবার জন্য তিনি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি কি করিলেন? পঞ্জাবের যাহারা গরিব লোক তাহাদিগের প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগের মধ্যে গেলেন। ধনী মানী বিদ্বান্ বড় মানুষ অঘোরকে কেহ আকর্ষণ করিতে পারিল না। প্রবলভাবে গরিবেরা তাঁহাকে টানিল। বৃদ্ধেরা শিশুর ন্যায় তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিল, তাঁহাকে সকলে গুরু বলিল। তিনি উত্তর ভারতের গরিব বৃদ্ধগণকে শিক্ষা দিতেন, উপদেশ দিতেন। দেশ হরিনাম কেন লইল না ইহা বলিয়া এমনি কাঁদিতেন যে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। ভক্ত ভিন্ন এরূপ কে কাঁদিতে পারে? তোমরা আমরা এমন কাঁদিতে পারি না, পর দুঃখে দুঃখী হইতে পারি না। ভক্তশ্রেষ্ঠ কাঁদিলেন, হরিনাম লইয়া প্রাণের ভিতরে আকুল হইলেন। তাঁহাকে ভক্ত বলিব কি যোগী বলিব? নববিধানে দুই মিশাইয়া তিনি দুই সুধা একত্র পান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ এই সাধুকে

সাধু বলিয়া আদর করিলেন। আর তিনি কনিষ্ঠ রহিলেন না, সকল অপেক্ষা তিনি জ্যেষ্ঠ হইলেন, জগজ্জনে তাঁহাকে শ্রদ্ধা ফুল অর্পণ করিবে। আর আমরা তাঁহাকে স্নেহসম্ভাষণ করিব না, তিনি তাহার অতীত। ধর্ম্মসম্বন্ধে তিনি অগ্রগণ্য হইলেন। নববিধানবাদিগণের নিকটে তিনি ভক্তি ও যোগের পথ প্রকাশ করিলেন। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ প্রেষ্য সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়া আমাদিগের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিলেন। অবিলম্বে আমরা তাঁহার নাম স্বর্গীয় সাধুগণের মধ্যে নিবিষ্ট করিয়া তাঁহাকে অগ্রগামীর সম্মান অর্পণ করিব। তিনি সাধু। কি নির্ব্বিকারচিত্ত, কি বালকস্বভাব! কলিকাতায় তাঁহার শত্রু নাই, বিদেশে তাঁহার শত্রু দেখিতে পাওয়া যায় না, এ প্রকার লোকের মৃত্যু কি অমঙ্গল? সে লোক সকলের অগ্রগণ্য; চির দিন তাঁহাকে প্রেমের সঙ্গে সেবা করিব। সকলের শ্রদ্ধেয় শত্রু-শূন্য এমন কে আছে? তাঁর নাম সকলের প্রিয়। তাঁর সুখ্যাতিতে আমাদিগের বিশেষ সুখ। অঘোরকে, ব্রাহ্মগণ, তোমরা কখন ভুলিতে পার না। মার সম্বন্ধে তিনি আমাদিগের বিশেষ শ্রদ্ধেয়। আমরা সকলে তাঁহাকে আমাদের উপরে স্থান দিব। আমাদের কার্য্য আমরা করিব। আমরা কাঁদিব না। শরীরের দুঃখ, শরীরের শোক, শরীরের নিয়মে কমিয়া যাইবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধুগণ যেমন, তেমনি এই অশরীরী সাধু ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সকল স্থানে আদৃত হইবেন। কালক্রমে সকলে সেই অশরীরী আত্মাকে সাধু সাধু বলিয়া সাধুবাদ করিবেন, সহায় বলিয়া সম্মান দিবেন, শ্রদ্ধা করিবেন। অঘোর তোমাদের বন্ধু, তোমাদের শুভ ইচ্ছা প্রার্থনা তিনি গ্রহণ করিবেন। বাড়ীতে যখন আত্মোন্নতির জন্য প্রার্থনা করিবে, তখন তাঁহার জন্য ভক্তির সহিত প্রার্থনা করিবে। হৃদয় মধ্যে অঘোর চরিত্র, তাঁহার শান্তভাব, তাঁহার ক্ষমাশীলতা, তাঁহার সরলা ভক্তি, বাল্যস্বভাব, এবং দীনতা, পোষণ করিয়া ঈশ্বরের পথে ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হও। আমাদের প্রাণের বন্ধু ঈশ্বরের ক্রোড়ে পুণ্য শান্তিতে বর্দ্ধিত হইতে থাকুন। সকলে বল "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"

সৎসঙ্গ।

রবিবার ৪ঠা পৌষ, ১৮০৩ শক।

হে ব্রাহ্মসমাজ শ্রবণ কর। অদ্য শুভ দিনে ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে স্বর্গবাসী সাধু যোগিগণের মধ্যে অঘোর নাথ সাধুনামে আখ্যাত হইলেন। ঈশ্বর সম্মতিতে ভক্তগণের অনুমোদনে তিনি সাধুর নাম সাধুর আদর সাধুর গৌরব ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। নববিধান এই কথা প্রচার করিলেন, স্বর্গ সায় দিলেন। জীবিতগণ মৃতের সাধু নাম অনুমোদন করিলেন। পৃথিবী এই সংবাদ প্রচার করিল, দেশের লোক সকল ইহা শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল। এত দিন জীবিত ব্যক্তি লইয়া ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মবিধান সাধন করিয়াছেন। পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইয়া গেল, এখনও আমাদিগের মধ্যে পরলোকের তত্ত্বসাধন আরম্ভ হয় নাই। ব্রাহ্মগণ এত দিন জীবনের আদর করিয়াছেন, বিধানের আজ্ঞায় মরণ আদরণীয় হইতে লাগিল। ব্রাহ্মেরা আবির্ভাবে উৎসাহ ও প্রীতি লাভ করিতেন, তিরোভাবে অনেক ভাল ভাল কথা শিখিতে লাগিলেন। ইহলোকের তত্ত্বসম্বন্ধে অনেক উক্তি আছে, কিন্তু পরলোকের তত্ত্ব কি, পরলোক কি প্রকার, তাহার ভাব ভঙ্গী কি তদ্বিষয়ে সৎপ্রসঙ্গ অধিক হয় নাই। এত দিন আমাদিগের মধ্যে ইহলোকের কথা ছিল, পরলোকের কথা ছিল না। এখন ইহলোক পর-লোক দুইয়ের যোগ হইল। ইহলোকের শাস্ত্রের সঙ্গে পরলোকের শাস্ত্রের মিলন হইল। সাধকের জীবন থাকিতে পরলোকের কথা হয় না পারলৌকিক মতের কথা কি, এক জন ভক্তের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়; কাহার সম্বন্ধে এরূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে? সেই ব্যক্তিসম্বন্ধে, যে ঈশ্বরের ধর্ম্ম সাধন করে, সাধু নামের গৌরব প্রকাশ করিতে পারে। ইতিপূর্ব্বে আমরা কাহাকেও সাধু করি নাই, আমাদিগের মধ্যে কেহ কাহাকেও করে নাই, আমরা এ কথা শুনি নাই বা প্রচার করি নাই। এখন প্রকৃত পথ প্রকাশ পাইল, সর্ব্ববাদী সম্মতিতে সংঘটিত হইল, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এক জন সাধু হইলেন, সাধুদিগের সঙ্গে মিশিলেন। সাধুর প্রতি সম্মান দেখান,

সাধুর প্রতি ভক্তি সাধন, এ সমুদায় এক জন লোকের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য হইল। অতএব ব্রহ্মতত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় করিয়া জীবতত্ত্বকে পবিত্র করিবার জন্য ঈশ্বরবিশ্বাসীমাত্রেরই সাধ্যমত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। উপাসনা, আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা প্রভৃতি যেমন কর্ত্তব্য, হে পরলোকের যাত্রিগণ, তেমনি পরলোকসম্বন্ধেও অপর কর্ত্তব্য। এখন বিশেষ সময় উপস্থিত। আমাদিগের মধ্য হইতে এক জন গেলেন, এখন তাঁহারই ভিতর দিয়া আমাদিগের সকলকে পরলোকে যাইতে হইবে। অতএব সাধু সম্মানের মত তোমাদিগের ধর্ম্মসমাজের মধ্যে, বিধানমণ্ডলী মধ্যে জীবিত থাকুক। সাধুগণ আলোচনার বিষয়, স্মরণের বিষয়, তাঁহাদিগের মৃত্যু বিশ্বাসের বিষয় হয়। মৃত্যু তাঁহাদিগের সম্বন্ধে জীবনপ্রদ হইল। মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সদালাপ সৎপ্রসঙ্গ প্রয়োজন। সকল ভাই পৃথিবীতে রহিল, এখন আর বাহ্যিক আকার দেখিবার সম্ভাবনা নাই। এখন সৎপ্রসঙ্গে জীবিতগণ মৃতের দলভুক্ত। নববিধান জীবিত ও মৃতকে এক দলভুক্ত করিলেন। যিনি ইহলোকে রহিলেন না, তিনি আমাদিগের দলভুক্ত হইয়া রহিলেন। দল ভাঙ্গিল বলিয়া, আমাদিগের মধ্যে অমুক নাই বলিয়া যে ক্ষুণ্ণ হয়, সে অবিশ্বাসী। আমাদিগের এক জন পরলোকে যাওয়াতে ইহলোক পরলোক এক হইল, সাধুগণের সঙ্গে আমাদিগের সম্বন্ধ স্থায়ী হইল, এই নূতন সম্বন্ধ জন্য নূতন কর্ত্তব্য উপস্থিত হইল। পরলোকে সকলে বন্ধুকে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। এখন সকল প্রকারের পত্র পৃথিবীর ডাকে আর পাঠাইতে হইবে না। এখন আমাদিগের পত্র সহজে স্বর্গে পাঠাইতে পারিব। আমাদিগের বন্ধুর মধ্য দিয়া পত্র স্বর্গে যাইবে। আমাদিগের মধ্যে এক নূতন বিধান খুলিল। এক পার্থিব সম্বন্ধ ছিল, এখন ইহলোক পরলোকের সম্বন্ধ খুলিল। ইহলোকের ভদ্রতাই আর শেষ নয়, কত সৎপ্রসঙ্গ সদালাপ পরলোকের সাধুগণের সঙ্গে হইবে। এই নূতন সম্বন্ধ আমাদিগকে সাধন করিতে হইবে। কি প্রকারে সাধন করিব? আমাদিগের এক নূতন রাজ্য স্থাপিত হইল। আমাদিগের এক জন সাধুনামে কীর্ত্তিত হইলেন, আমরা তাঁহাকে সাধুনাম দিলাম, পরলোকে আমাদিগের বাড়ী সংস্থাপিত হইল, আমাদিগের এক ঘর জ্ঞাতি স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত হইল।

আত্মীয় স্বজনকে বসাইতে পারেন এ জন্য এক খণ্ড বিস্তৃত ভূমি তিনি পাইলেন। এক জন বণিককে স্বর্গে পাঠান হইল যিনি বাণিজ্য ভাল বোঝেন। এক জন বিষয়ী লোককে পাঠান হইল, যিনি বিষয়কার্য্যে বিলক্ষণ সুপটু। এই সকল আলোচনা করিয়া দেখ এখন কিরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে। নূতন কর্ত্তব্য উপস্থিত। নূতন ঘর ভবসাগরের পরপারে বান্ধা হইল। সে ঘরের শোভা কি যোগপক্ষীর নিকট প্রকাশ পায় নাই? সাধুদিগের মত স্থির করিয়া লও। এ সম্বন্ধে কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইও না। সাধুর শরীর লইয়া আমরা কি করিব? সাধু দর্শন সাধু পাঠ সাধু আলোচনা সাধুসাধনের সার। সাধুর সঙ্গে বাহ্যিক কথোপকথন আলাপ এ পৃথিবীর, পরলোকের নয়। পরলোকের সম্বন্ধ আধ্যাত্মিক। আত্মার ভিতর দিয়া পরলোকের বিষয় দেখিতে হইবে। বাহিরের চক্ষে পরলোকের সাধুগণকে দর্শন কুসংস্কার, বাহিরের হস্তে যে তাঁহাদিগকে ধরিতে যায়, সে পাগল। পৃথিবীর প্রণালীতে তাঁহাদিগকে ধরিতে গেলে অপরাধী হইতে হয়, তাঁহারা তদ্দ্বারা অপমানিত হন। ভক্তকে ভক্তি বাহিরের নহে, আত্মা দ্বারা ভক্তি করিতে হইবে। পৃথিবী ও স্বর্গ এ দুয়ের ভিতরে সেতু নির্ম্মাণ করিতে হইবে, ভিতরের পথ দিয়া করিতে হইবে, তথায় যাইতে হইলে মনের ভিতর দিয়া রাস্তা। সেখানে বাহির দিয়া যাইবার যো নাই। এখানে ইচ্ছা হইলে হইবে না। যিনি সম্প্রতি সেখানে গিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিতে হইলে কি তাঁহার শরীর দেখিব? বিধান বলিতেছেন এরূপ করিতে হইবে না। তাঁহাকে মনোমধ্যে দেখিতে হইবে। তাঁহাকে দেখিতে হইলে এখন তাঁহার বাড়ীতে যাইতে হইবে। সমুদায় ঈশ্বরবিশ্বাসিগণকে মনের ভিতর দিয়া গমন করিতে হইবে। সাধু ভুলিব না, কিন্তু সাধুর শরীরের সম্বন্ধ যোগ করিব না, শরীরের সম্বন্ধ যোগ করিলে পাপ হয়। মনের মধ্যে দেখিব, মনের মধ্যে কথা বলিব হরির ভিতর দিয়া হরির মধ্য দিয়া। হরিকে ছাড়িয়া সাধুজ্ঞান ভ্রান্তি। হরিকে অতিক্রম করিয়া স্বর্গরাজ্য দেখিতে গেলে আলোক নির্ব্বাণ করিয়া বস্তু দর্শন করিবার ন্যায় হইবে। হরির আলোক পড়িলে তবে দেখিতে পাইবে। খ্রীষ্টকে কে জানিতে পারে, গৌরাঙ্গকে কে গ্রহণ করিতে পারে? ঈশ্বরের আলোক

না পড়িলে কেহ তাহাকে জানিতে পারে না। ঈশ্বরের আলোক যতটুকু পড়িবে, ততটুকু তাঁহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যাইবে। আলোক হইলে সমুদায় ভাল দেখিতে পাইবে। অঘোর তোমাদিগের সঙ্গে ছিলেন, এখন যদি ঈশ্বরের আলোক না পাও, ফল এই হইবে তাঁহাকে আর দেখিতে পাইবে না। বাহিরের বস্তুগুলি যেমন, এমনি উজ্জ্বল বস্তু কাছে রাখ, আদর কর, ভক্তি কর, চেষ্টা যত্ন কর, দেখিবে, প্রভেদ কিছুই বুঝিতে পারিবে না। ঈশ্বরের নিকট উপায় প্রার্থনা কর, অঘোরভাবসম্পন্ন হইতে যত্ন কর, হরির আলোক পড়িয়া জ্যোতিষ্মান্ হইলে তবে তাঁহার সঙ্গে তোমার প্রসঙ্গ হইবে। হরির প্রতিভা না হইলে কিছুই প্রতিভাত হয় না। এই নিয়মে ঈশ্বরকে ডাক, তিনি আপনি ছেলেকে ডাকিয়া আনিয়া তোমাকে দেখাই-বেন। রাস্তায় বসিয়া সাধুকে ডাকিলে কেহ সাক্ষাৎ পায় না। যিনি যত আমাদিগের নিকটে, তিনি তত আমাদিগের নিকট হইতে দূরে। ঈশ্বর অনুগ্রহ না করিলে কখন নিকটের সাধুকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। মন বিশুদ্ধ কর, পরলোকের বিশ্বাস উজ্জ্বল কর, ঈশ্বরের ভক্তিতে উন্নত হও, ব্যাকুলহৃদয়ে মনের ভিতরে প্রার্থনা কর, ঈশ্বর তোমার বন্ধুকে দেখাইবেন, তোমার বন্ধুকে তুমি ঈশ্বরের ক্রোড়ে দেখিতে পাইবে। ঈশ্বরের ক্রোড়ে সাধুগণ দাঁড়াইয়া আছেন, ঈশ্বর না দেখাইলে দেখিতে পাইবে না। উৎকৃষ্ট সাধু, মধ্যম সাধু, কনিষ্ঠ সাধু সকলকে ঈশ্বরমধ্যে দর্শন করিতে হইবে, সাধুদর্শনের এই নিয়ম। অতএব ঈশ্বরের মধ্যে সাধুকে দর্শন কর, ঈশ্ব-রের মুখের আলোক না পড়িলে কখন দর্শন হইবে না। দর্শন হইলে আর কি? দেখিলে এখন বরণ কর, সাধন কর। তাঁহাদিগকে হৃদয়ে রাখিয়া সৎপ্রসঙ্গ কর। ঠিক যেমন মনুষ্যের সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গ করিয়া থাক, তেমনি করিতে হইবে। এখান হইতে তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া তাঁহা-দিগের সঙ্গে সম্বন্ধ চলিয়া গিয়াছে, এরূপ মনে করিও না। পার্থিব সম্বন্ধ তাঁহাদিগের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে, এখন আর তাঁহাদিগের সঙ্গে মিলন হইতে পারে না, স্বর্গে গিয়া তবে তাঁহাদিগের সঙ্গে সম্মিলন হইবে, এরূপ মনে করিও না। সংসারের পরপারে গিয়া পৃথিবীর পিতা আরো নিকট হইলেন, বন্ধুর বন্ধুতা আরো নিকট হইল, প্রত্যেক সাধুর সঙ্গে আমা-

দিগের আরো নিকট সম্বন্ধ হইল। মরিলেই সম্বন্ধ গেল, ইহা হইতে পারে না। এখানে জীবন থাকিতে এক শ্রেণীভুক্ত, চলিয়া গেলে অপর শ্রেণীভুক্ত, ইহা মনে করিতে পার না। এক সময়ে যাহাকে দেখিয়াছি, সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখিব। যখন এখানে নাই, তখন ক্রমান্বয়ে ভাবিব, চক্ষের আড় হইলে সব আড় হইল, এ পাগলের কথা অবিশ্বাসীর কথা। সাধু যিনি তিনি আছেন। পাঁচ জনের সঙ্গে যেমন সম্বন্ধ ছিল তেমনই রহিল, মরিয়াছেন বলিয়া তিনি অগ্রাহ্য হইলেন, আজ শ্রাদ্ধ কর্ম্ম করিয়া সমুদায় সম্বন্ধ শেষ হইল এরূপ কখন মনে করিব না। শ্রাদ্ধে পার্থিব সম্বন্ধ শেষ হইল বলিয়া স্বর্গীয় সম্বন্ধের শেষ হইল তাহা নহে। শ্রাদ্ধ পার্থিব সম্বন্ধের শেষ, স্বর্গীয় সম্বন্ধের আরম্ভ। আর যাঁহার শ্রাদ্ধ করিলাম, স্বর্গে তিনি জীবিত হইলেন এই কথা ভাবিব; এখানে সম্বন্ধ পূর্ব্বাপেক্ষা আরো স্পষ্টতর। মুখে বলিলে হয় না। সকলে দেখিলেন বন্ধু মরিয়া গেলেন; কিরূপে তাঁহাকে নিকটে করিবে, এই দশ দিন তাঁহাকে যত্ন করিয়া স্মরণে রাখিলে, এখন তাঁহাকে কিরূপে ভাবিবে, পন্থা বলি শ্রবণ কর। সাধুসম্বন্ধে এই মত সাধন কর। বাহির দিয়া সাধুকে পাওয়া যায় না, হরির মধ্য দিয়া সাধুকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, হরিতে সাধুকে জাজ্বল্যমানরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, এই বিধি। চরিত্রের নৈকট্যে স্বভাবের নৈকট্যে সাধু নিকটতর হন। হৃদয় সাধুকে আত্মীয় করে, পরিবার করে। চরিত্রে নিকট না হইয়া সাধুর চরণ চুম্বন করিলে, বন্ধুর ছবির সমাদর করিলে, নৈকট্য হয় না। স্বর্গের বন্ধু আপনি কি আমাদিগের হইতে পারেন? কখনই না। হাতে ধরিয়া ঈশ্বর স্বর্গের বন্ধুকে আনিয়া মিলিত করেন। ক্ষমাশীল যোগীর নিকটতর হইতে হইলে ক্ষমাশীল যোগী হইতে হইবে। যদি তুমি ক্ষমাশীল না হও, যোগী না হও, তিনি তোমার বাড়ীতে পা দিবেন না, কথাও বলিবেন না, মুখও দেখিবেন না। তুমি যদি শঠ ধূর্ত্ত রাগী যোগবিহীন হও, সাধু অঘোরের সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। তোমার সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ ঘুচিয়া যাইবে। পাপপরায়ণ ব্রহ্মজ্ঞানী যদি সাধু হইতে চাও, হইতে পারিবে না। তোমার মনে কোন গুণ থাকিলে, সেই গুণে যত সাধুর নিকটবর্ত্তী হইবে, বুকের ভিতরে রক্তের ভিতরে আহারের মধ্যে

বিপৎপাতের মধ্যে সকল অবস্থার মধ্যে চরিত্রের সম্মিলন করিলে সাধুর নিকটবর্ত্তী হইবে! নৈকট্যে চরিত্রে চরিত্রে ঠেকিবে, গায়ে গায়ে ঠেকিবে, স্বভাবে স্বভাবে ঠেকিবে। প্রাণে প্রাণে মিলন না হইলে সাধুভক্তি হয় না, গুরুভক্তি হয় না, সাধুর উপযুক্ত সমাদর হয় না। অঘোরের পরলোকের ছবি দেখ। এখন তাঁহার শরীর কল্পনা, বাহিরের চক্ষু আর তাঁহাকে দেখিবে না। সাধুর নৈকট্য চরিত্রের নৈকট্যে। ঈশা গৌরাঙ্গ প্রভৃতি সহ সম্বন্ধের যে নিয়ম, তাঁহাদের গুণসম্পন্ন না হইলে যেমন তাঁহাদিগের সহিত কোন সম্বন্ধ থকে না, প্রত্যেক ভাই প্রত্যেক মানুষসম্বন্ধে এই কথা। কিসে দুজনে নৈকট্য হয়। আমি হরিভক্ত তুমিও সেইরূপ; বন্ধুতা আত্মীয়তা এইরূপ সম্বন্ধ। ছোট বড় সকল লোকের সম্বন্ধই এইরূপ। যতটুকু সাধুর গুণ আমাতে আছে, ততটুকু আমার সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ। গুণের ঐক্য না থাকিলে সাধুর সঙ্গে সম্পর্ক থাকে না। যদি আমি সে অবস্থায় ভক্তি করি তবে সে কপট ভক্তি। কেবল বাহিরে ভক্তি দেখাইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া এখানে পার পাইব না। সাধুকে ভক্তি করিতে হইলে বাস্তবিক চরিত্রের নৈকট্য চাই, স্বভাবেও মিলন চাই। তাঁহারা নিজ নিজ চরিত্রের দ্রব্য দ্বারা ভক্তিযোগে সাধুতা পরিপুষ্ট করেন। কি জন্য অঘোর আসিয়াছিলেন ঈশ্বর জানেন, তবে ইহা তুমিও জান আমিও জানি যে তিনি সাধু জীবন দেখাইবার জন্য আসিয়াছেন। অঘোরের পিতা এক জন হিন্দু যোগী ছিলেন। অঘোর বাল্যকাল হইতে যোগপ্রিয়। যোগের ভাব প্রস্ফুটিত করিবার জন্য, ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে যোগীর বিধি প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি যোগমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি এই সাধন অবলম্বন করিয়া যোগীর আদর্শ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই ঘটনা ইতিহাসে চিরকাল থাকিবে। তাঁহার ছবি চিরদিন পৃথিবীতে থাকিবে, তাহার নিগূঢ় হেতু এই যে তিনি যোগী ছিলেন। তিনি যোগী বলিয়া আদৃত হইবেন, যোগী বলিয়া তাঁহাকে সকলে বরণ করিবে। তিনি কোন্ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন? যোগে। একাগ্রতা তাঁহার ভূষণ ছিল। সাধু বলিয়া তাঁহাকে স্মরণ করিব, কিন্তু যখন কেহ জিজ্ঞাসা করিবে কি জন্য তিনি বড়? তিনি সত্য কথা

বলিতেন, কিংবা তাঁহার অনেক সদ্গুণ ছিল তজ্জন্য তিনি বড়? তাহা অপরেরও আছে। তবে কি তাঁহাতে ছিল, যাহার জন্য তিনি ব্রাহ্মমণ্ডলীতে উচ্চতম স্থান প্রাপ্ত হইলেন? ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে তিনি যোগী ছিলেন। তিনি যোগী এই তাঁহার বিশেষ লক্ষণ ছিল। ঈশ্বর তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, মানুষ তাঁহাকে সাধু বলিয়া বরণ করিল, ঈশ্বর ও মানুষে মিলিল। আমরা তাঁহাকে নমস্কার করিয়া যোগী বলিব। ব্রহ্মপ্রেম তাঁহাকে যোগী করিল, মাতৃগর্ভে তিনি যোগভাব পাইলেন। বয়ঃসহকারে তিনি যোগসাধন করিলেন, সকলে তাঁহাকে যোগী বলিয়া স্বীকার করিল। যোগভাব তাঁহাতে প্রবল ছিল, তাঁহার জীবন যোগ-প্রধান। তাঁহাতে ভক্তি ছিল, সদ্গুণ ছিল, কিন্তু এই যোগেতে তিনি উচ্চ। সকল চিন্তা ছাড়িয়া এক ঘণ্টা অবিচ্ছেদে আমরা ঈশ্বরে তেমন মন স্থির করিয়া রাখিতে পারি না, তিনি যেরূপ পারিতেন। আমাদের চেষ্টা করিতে হয়, যত্ন করিতে হয়, বসিবামাত্রই তাঁহার মন প্রস্তুত। তাঁহার একচিত্ততা সহজ ছিল। তিনি স্বভাবতঃ নির্জ্জন স্থান অন্বেষণ করিতেন। তিনি মনুষ্যের কোলাহলে বিরক্ত ছিলেন। তিনি সংসারে ছিলেন, সংসারের মধ্যে থাকিয়া যোগী হইলেন। তিনি বিষয় কার্য্য করেন নাই তাহা নহে। তিনি প্রতিদিন ১০।১২ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতেন। তিনি স্বয়ং শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, কার্য্য কর্ম্ম দেখিতেন, লেখা পড়া করিতেন, স্ত্রীলোকদিগকে ধর্ম্মজ্ঞান উপদেশ দিতেন, সংপ্রসঙ্গ করিতেন, যে সকল বিষয় পরিশ্রমসাধ্য তাহাতে দিবানিশি ব্যস্ত ছিলেন। তিনি পরিশ্রমী ছিলেন, আলস্যকে বিষবৎ একান্ত ঘৃণা করিতেন। এই জন্য বলি তিনি যোগী ছিলেন। সংসারে গুরু তিনি, ঊনবিংশ শতাব্দীর যোগী তিনি। আমাদিগের যোগী, জ্ঞান, ভক্তি, সংসার ধর্ম্ম, বিষয় কর্ম্ম সকল লইয়া যোগ সাধন করিতেন। এত পরিশ্রম চেষ্টার মধ্যে যখন তিনি যোগে বসিতেন কোন দিকে তাঁহার মন যাইত না। এক দিকে তিনি ব্রহ্মচরণ সেবা করিতেন, আর এক দিকে যোগে তাঁহাকে চিন্তা করিতেন, ব্রহ্মে মগ্ন থাকিতেন। ঈশ্বরে বিলীন হইয়া গিয়া এ সংসারের সকল ভুলিয়া যাওয়া সে এক যোগ সাধন, এ এক যোগ সাধন, এ দুই যোগ সাধনে কত

প্রভেদ। আমরা যখন উপাসনা করি, দুষ্ট অশ্বের ন্যায় আমাদিগের মন কত দিকে ধাবিত হয়, কত বার ধ্যান ভঙ্গ হয়। সাধু যোগী আমাদিগের বন্ধু ব্রহ্মমন্দিরে নিজ যোগ-জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এই দান সকলে গ্রহণ কর। শ্রদ্ধেয় ঈশ্বরানুগত ঈশ্বরদাস আমাদিগের বন্ধুর নামে আমাদিগের মন পবিত্র হইবে, উচ্চ যোগচরিত্র আমাদিগের আদরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদিগকে আমাদিগের জীবনে বন্ধুত্বের পরিচয় দিতে হইবে। উপাসনার সময়ে মন এ দিকে ও দিকে না যায়, হৃদয়ের শান্তি ও স্থৈর্য্য থাকে, এক বারও মন বিক্ষিপ্ত না হয়, এই ব্রত সকলকে গ্রহণ করিতে হইবে। এ সময়ে এক মনে এক স্থানে যোগসাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অঘোরচরিত্র হৃদয়ে নিবিষ্ট করিয়া দিন দিন যেন যোগের পথে শান্তির পথে অগ্রসর হই।

কর্ম্ম-যোগ।

রবিবার, ২৯ কার্ত্তিক ১৮০৩ শক।

সকলেরই এক দিন মৃত্যু হইবে, এ জীবন পৃথিবীতে চিরকাল থাকিবে না। কিন্তু যাহা করিবার তাহা না করিয়া যে ব্যক্তি পৃথিবী হইতে চলিয়া যায়, সে অতি নরাধম। ভৃত্য বেতন পায়, কিন্তু যে ভৃত্য কার্য্য করে না কে তাহাকে বেতন দিবে? তোমরা ভৃত্য, হে নববিধানবাদী ব্রাহ্ম, তোমাদিগকে এই জন্য বেতন দেওয়া হয় যে তোমরা উপযুক্তরূপে কার্য্য করিবে, তোমরা কখন কার্য্য না করিয়া থাকিতে পার না। পরম প্রভুর নিকটে পুরস্কার প্রাপ্ত হইবার আশা করিলে অনেক দিন তাঁহার কার্য্য করিতে হইবে, অচিরে তোমাদিগের জীবন নষ্ট হইতে পারে না। প্রভু মনুষ্যকে অতিপ্রথমে যে কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছেন, যাবজ্জীবন তাহাকে তাহা প্রতিপালন করিতে হইবে। শীঘ্র কার্য্য শেষ না করিয়া মরিলে আমাদিগের মরা পাপ হইবে। তুমি তোমার কার্য্য শেষ না করিয়া ইহলোক হইতে পরলোকে যাইতে পার না। ভৃত্য যদি আগে পলায়ন করিতে চায় কেহ তাহাকে যাইতে দিবে না। আগে সমুদায় কার্য্য শেষ করিয়া দাও পরে

ঈশ্বর তোমাকে অবসর দিবেন। যিনি চিকিৎসাব্যবসায়ী তিনি কেবল রোগশান্তির উদ্যোগ চেষ্টা করিবেন, উপেক্ষা করিতে পারেন না। যত ক্ষণ না রোগের প্রতিকার হয়, তত ক্ষণ তাঁহার নিষ্কৃতি নাই। যদি তোমারা কার্য্য শেষ না করিয়া যমালয়ে যাইতে চাও, যম কখন তোমাদিগকে স্পর্শ করিবে না। পলায়ন করিয়া কোথায় যাইবে? সৃষ্টির সময়ে ঈশ্বর যে কথা বলিয়া দিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিতে পার না। কার্য্য না করিয়া ইহলোক হইতে পলায়ন করিলে দুর্নাম হইবে, পরলোকে কষ্ট সহ্য করিতে হইবে। যদি কার্য্য করিয়া চলিয়া যাও, বিশেষ পুরস্কার লাভ করিবে। ভৃত্য কার্য্য করিলে তবে সে বেতনের যোগ্য হয়। হে ব্রহ্মভৃত্যগণ, তোমরা কি কার্য্য করিতেছ? তোমরা কি জন্য দেহ ধারণ করিতেছ? কত লোক আসিল চলিয়া গেল, অদ্যাপি তোমরা বাঁচিয়া আছ কেন? রোগযন্ত্রণা অনেক ভোগ করিলে, অকালে মৃত্যু হইল না কেন? এক এক সময় কণ্ঠাগত প্রাণ হইয়াও পুনরায় বাঁচিলে কেন? ইহার অর্থ এই, কার্য্য শেষ না করিয়া যাইতে পার না। কেহ প্রভুর কার্য্য শেষ না করিয়া পরলোকে যাইতে পারে না, নববিধান এই ব্যাপার জগৎকে দেখাইবে। পৃথিবীতে ঈশ্বরের কার্য্য শেষ না হইলে পরলোকের দ্বার অবরুদ্ধ হইবে, সুতরাং সাবধান হইয়া ইহলোকে কার্য্য শেষ করিতে হইবে। দাসের প্রতি ঈশ্বরের যাহা অনুজ্ঞা তাহা কে ফিরাইতে পারে? ভৃত্যমণ্ডলীর কি কার্য্য। দুবেলা উপাসনা করা, ধর্ম্মালোচনা করা, ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করা, সংসারের কর্ত্তব্য সাধন করা, দান ধ্যান করা, এই সকল করিলে কি পরলোকে যাইবার উপযুক্ত হইবে? তোমাদের এরূপ করিয়া জীবন কাটান অন্যায়। তোমরা এজন্য আইস নাই। নববিধান কি করিবেন, তোমাদের কি দায়িত্ব মনে আছে? পৃথিবী হইতে সর্ব্ববিধ পৌত্তলিকতা দূর করিয়া দেওয়ার জন্য ঈশ্বর তোমাদিগকে দূত প্রেরণ করিয়াছেন। একেশ্বরবাদ বহন করিবার জন্য তোমরা আসিয়াছ। চারি হাত দশ হাত ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল প্রকারের মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে। সমুদয় মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্ম দেখিতে পাইবে। পৃথিবীকে এই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বুঝাইয়া দিয়া অবতারবাদ খণ্ডন করিতে

হইবে। তোমাদের এ উদ্দেশ্য সাধিত না হইলে উপাসনালয় যমালয় হইবে; পৃথিবীর তাহাতে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি। তুমি বলিলে আমার আর করিবার কি আছে, বলিলে আর মরিলে। এ পথে গেলে আর উন্নতি নাই, মৃত্যু। স্বপ্ন যেমন, তেমনি জীবনের সমুদায় ঘটনা কল্পনা হইয়া যাইবে। তোমার সকলই লোকের নিকট ছায়ার ন্যায় মিথ্যা প্রতীত হইবে। বল তোমার জীবন আর কেন লোকে স্মরণ করিবে। পৃথিবী তোমার এই মিথ্যা জীবনের জন্য, গৌরব না দেয় তবে তাহাকে তজ্জন্য ধন্যবাদ। তোমরা বলিতেছ তোমাদিগের কর্ত্তব্য ফুরাইয়াছে, নববিধান কখন কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে বুঝিতে দেন না। পৃথিবীতে যত দিন থাকিবে, পৃথিবীর প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করিবে ইটি তোমার অভিলাষ নহে, ঈশ্বরের অভিলাষ। ঈশ্বর কর্ত্তব্য সাধন কবিবার জন্য পাঠাইলেন এই বিশ্বাসে বক্ষঃ স্ফীত কর। মনুষ্য নানা পথে যাইতেছে, তাহাদিগকে জানিতে দাও যে সকল পথ এক স্থানে সম্মিলিত হইয়াছে। কেহ অদ্বৈত-বাদ অবলম্বন করিতেছে, কেহ বা পৌত্তলিক হইতেছে, কেহ বা সমুদায় ধর্ম্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া নাস্তিক হইতেছে। বিস্তীর্ণ পৃথিবী, তুমি একা কি করিবে? তুমি যদি এখানে কার্য্য করিতে চাও, তোমার নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ থাকিবে না। তোমার চক্ষু ঈশ্বরের দিকে রাখ, বক্ষে হাত রাখিয়া তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর কর। তাঁহার কৃপায় তুমি এমন সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া চলিতে সক্ষম হইবে যে, অদ্বৈতবাদ এবং পৌত্তলিকতার যে অংশ সত্য তাহা তুমি অনায়াসে গ্রহণ করিবে অথচ তুমি অদ্বৈতবাদী বা পৌত্তলিক হইবে না, ভ্রম কুসংস্কারে পড়িবে না। হে ব্রাহ্ম, তুমি এইরূপে ঈশ্বরপ্রসাদে সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া চলিয়া যথার্থ একেশ্বরবাদ জগৎকে দেখা-ইবে। তুমি এই কার্য্য সাধন করিয়া যাইতে পারিলে দেখিবে ঈশ্বর তোমার জন্য স্বর্গে সিংহাসন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। ঈশ্বরের স্বর্গীয় দূত আসিয়া তোমাকে ঈশ্বরের পার্শ্বে লইয়া যাইবে, এবং সেখানে সাধুমণ্ডলীর মধ্যে তোমাকে উন্নত স্থান অর্পণ করিবে। তাই বলি একা ঈশ্বরকে স্পষ্টরূপে সকল লোকের নিকট দেখাও। পৃথিবীর ছোট ছেলেরা যেমন তাহাদের মাকে ভাল বাসে, তেমনি সেই নিরবয়ব অরূপমনোহর

মাকে কেমন ভাল বাসা যায় তাহার প্রমাণ জগৎকে দেখাও। এখানে অণুমাত্র ভ্রম তোমাকে স্পর্শ করিবে না, অথচ মার কত মূর্ত্তিকে হৃদয়ের প্রেমকুসুম দিয়া অর্চ্চনা করিবে। তুমি মাকে ভক্তি করিবে, ভক্তির পরাকাষ্ঠা লাভ করিবে, অথচ মূর্চ্ছিত হইবে না, অজ্ঞান হইবে না। সর্ব্বদা জাগ্রৎ অবস্থায় তাঁহার সঙ্গে আত্মার যোগ সমাধান করিবে। মাকে না দেখাইয়া, যোগ ভক্তির পরাকাষ্ঠা না দেখাইয়া, তুমি কখন পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইতে পার না। যদি ইহা সাধন না করিয়া চলিয়া যাও অকাল মৃত্যু হইবে, কাপুরুষের মৃত্যু হইবে। সাধু সন্তান বলিয়া কেহ তোমার নাম কীর্ত্তন করিবে না, তুমি যে তাঁহার কার্য্যভার লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলে তাহা দাঁড়াইবে না, সাব্যস্ত হইবে না। যে জন্য আসিয়াছ তাহা জগতের নিকট সাব্যস্ত কর, যে সমস্যা পূরণ করিবার জন্য আসিয়াছ তাহা পূরণ কর, যাহারা বাহিরে পড়িয়া রহিয়াছে তাহাদিগকে দলস্থ কর। পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে যাহাতে আর পৌত্তলিকতা অদ্বৈতবাদ ভ্রম প্রমাদ শুষ্কতা ধর্ম্মহীনতা নীতিহীনতা চলিতে না পারে, তাহার উপায় কর। সমুদায় করিয়াও যদি নিরাকারা শক্তিস্বরূপাকে দেখাইতে না পারিলে, তাহা হইলে কিছুই হইল না! মান্দ্রাজ বম্বে পেশোয়ার কন্যাকুমারী সকল স্থানে সিংহধ্বনিতে প্রচার করিলে, ক্রমান্বয়ে এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা চীৎকার করিলে, সেনাপতির কথা দ্বারা লোকের মনের ভাব উদ্দীপন করিলে, অথচ এ কথা বলিতে হইবে তোমার এ সকল অনুষ্ঠানে কিছুই হইল না। কেবল এই মাত্র তোমাকে জিজ্ঞাসা, তুমি কয় জন লোকের জীবন, সেই সেই স্থানে যথার্থ ধর্ম্মের পথে রাখিয়া আসিলে? যদি স্থানে স্থানে লোকে নূতন জীবন আরম্ভ করে তুমি যাহা বলিলে তাহা প্রতিধ্বনিত হইবে, ক্রমে সেই প্রতিধ্বনি প্রবলতর হইবে, সেই প্রতিধ্বনি তোমার কথাকে পরসীমায় লইয়া যাইবে। কিন্তু এখনও সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তৃত হয় নাই, ঈশ্বর বলিবেন আরও স্তব কর, সংগীত কর, আরও ধ্যান ধারণা উপাসনায় প্রবৃত্ত হও, যাহা ভারতে হইয়াছে, তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাও, আপনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যোগ করিলে চলিবে না। দেখাও, ভাইভগিনীদিগকে দেখাও যে এই

শুভক্ষণে প্রাচীন যোগের সমুদায় ভ্রম প্রমাদ পরিত্যাগ করিয়া ইহার সঙ্গে ইংরাজদিগের কার্য্য করিবার সামর্থ্য সংযুক্ত হইয়াছে। শেথাও আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যেরা যোগ সাধন করিতেন, আমরা ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়া তাঁহাদিগের যোগের সঙ্গে ইংরাজদিগের পরিশ্রম ও বৈষ্ণবদিগের ভক্তি মিশাইয়াছি, এইরূপ মিলাইলে যোগ ভ্রষ্ট হয় না। ইউরোপীয়ের পরিশ্রম ঘূর্ণিত করিতেছে, রক্তের ভিতরে ঘুরিতেছে। কার্য্যে ঘূর্ণিত আত্মা স্থির, শান্তভাবে ব্রহ্মযোগে নিমগ্ন। পৃথিবী ইহা কখন দেখে নাই। অনেকে হিমালয়ে বসিয়া ১০ বৎসর ১২ বৎসর ৫০ বৎসর যোগ সাধন করিল, যোগের জন্য রাজাও ফকির হইল, স্ত্রী পুত্র ধন জন সংসার সমুদায় বিদায় করিয়া দিল। একাকী নির্জ্জন দেশে পর্ব্বতশিখরে নদীতটে বসিয়া যোগী হইল, ঋষি হইল। এ সকল হইয়াছে, তুমি ব্রাহ্ম, তোমাকে আর কিছু দেখাইতে হইবে। আমি ঊনবিংশ শতাব্দীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, সর্ব্বপ্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি, অনেক ইংরাজী পুস্তক পড়িয়া বিদেশীয় তত্ত্ব, বিদেশীয় জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়াছি, ইংরাজী শিক্ষায় কোথায় সংসারে নাস্তিক্য বৃদ্ধি হইবে, না লোকে বিশ্বাসী হইবে? বিদ্যাতে কেবল অহঙ্কারই হয়, ইংরাজীতে কেবল বাহ্যসভ্যতার শোভাতেই লোককে শোভিত করে। ভারতবর্ষকে কি ব্রহ্মযোগ দ্বারা সংস্কার করিতে চাও? আর কি করিবে, ইংরাজী যন্ত্র সকল আনয়ন কর, যন্ত্র দ্বারা সকলই হইবে। বিজ্ঞান ও যন্ত্রকে সহায় কর, কল আর বুদ্ধি দুইকে একত্র কর, আর সমুদায় দূরে নিঃক্ষেপ করিয়া পরিশ্রম কর। আমরা বলি পরের হিতসাধন করিবার জন্য পরোপকারের পন্থা বাহির কর। দশ ঘণ্টার স্থলে বার ঘণ্টা পরিশ্রম কর, বাহিরে ঠিক যেন সাহেব, বিদ্যাতে পরিশ্রমে সুসিদ্ধ হইয়া ইংরাজীপরায়ণ হও। সেই অবস্থায় পূর্ব্ব ও পশ্চিমের বিদ্যা কি অদ্য বঙ্গদেশে মিলিত হইতে পারে না? মিলিত হইতে পারে, কেবল যোগে। এত কাল যাহা হয় নাই, আজ তাহা হইবে, সকলে বলিল তাহা হয় না, হয় না। যাই ব্রাহ্ম পশ্চিমের জ্ঞান পরিশ্রম যোগ করিলেন, আর পূজা হয় না। হয় না হয় না পৃথিবী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল। পূর্ব্ব পশ্চিমকে দুই হাতে

করিয়া প্রতিবাদ করিতে চেষ্টা করিও না। ভিন্ন দুই জিনিষ কখন এক হয় না, দুইকে এক করিতে চেষ্টা করিলে যোগ ভাঙ্গিবে। নিষ্ক্রিয়াপ্রধান যোগ সভ্যতার মধ্যে কি প্রকারে থাকিবে? সভ্যসমাজ নিশ্চয় যোগবিহীন হইবে। নববিধান বলিলেন, না। হৃদয়ে ঋষিভাব, পাশ্চাত্য বিদ্যার ভাব, যোগের ভাব, মাতৃগর্ভে সঞ্চারিত হইয়াছে। ইউরোপের বিদ্যার সঙ্গে এ দেশের যোগ একত্র হইবে। এক এক জীবনে পরস্পর বিরুদ্ধ ভাব সকল একত্র হইলে তবে স্বর্গ। সকলকে এক করিলে তবে স্বর্গে যাইবে। এখন সময় আসিয়াছে যে সময়ে এই মিলনের কার্য্য সম্পাদিত হইবে। যাহা অসম্ভব নববিধান তাহাকে সম্ভব করিবে। পৃথিবী এই মিলন দেখিবে ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা ইহা দেখিবে। যাঁহারা এই মিলন সাধন করিবেন, তাঁহারা জগতের মহৎ উপকার সাধন করিবেন। তাঁহারা সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন, প্রাতঃস্মরণীয় হইবেন। ভ্রাতঃ, তোমাকে নমস্কার করি, তুমি ইংরাজী লেখাপড়ার মধ্যে এই অসম্ভব কার্য্য সাধন করিয়া নাম রক্ষা করিলে। কেবল যোগ বৈরাগ্য বৈষ্ণবের খোল করতাল নামসঙ্কীর্ত্তন মিলাইলে নাম রহিবে না? বল নূতন কি করিলে? এত কাল যে প্রচুর লবণ খাইলে তাহার বিনিময়ে বল কি করিলে? তোমরা যে চাকর, সকলের ভৃত্য। প্রভুর কার্য্য তোমাদিগকে করিতেই হইবে। তোমাদিগের উপরে তিনি যে ভার অর্পণ করিয়াছেন তাহা তোমাদিগকে আদায় করিতেই হইবে। যে ব্যক্তির নববিধানের উপরে অনুরাগ আছে তাহার সকলকে সেবা করিতেই হইবে, পৃথিবীতে নূতন ভাবে ঈশ্বরের পূজা স্থাপন করিতেই হইবে। ঈশ্বরের ভৃত্য হইয়া সংসারের ভৃত্য হইয়া অন্যলোকদিগের মত আদায় দিলে চলিবে না। যাই বলিবে আর পারি না, স্বর্গের আদেশ মত খাওয়া বন্ধ হইবে। ঈশ্বরের লবণ যে খাইতেছ কাজ দেখাও। অমুকের চল্লিশ বৎসর বয়স, অমুকের পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইল, কিন্তু পৃথিবীতে যে জন্য আসা হইয়াছে, তাহার কি হইল? হৃদয়কে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার সদুত্তর দেও। আজ যদি মৃত্যু হয়, বল স্বর্গের দ্বার খুলিয়া দ্বারবান্ অনুগত ভৃত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে কি না? কার্য্য শেষ করিয়া মৃত্যু হইলে, পৃথিবী কেন তোমাদিগকে

ঈশ্বরের ভৃত্য বলিয়া গৌরব অর্পণ করিবে না! তোমরা বলিবে, কেন আমরা কেহ স্রষ্টাকে ভক্তি দিয়াছি, কেহ মুসার সঙ্গে মিলন করিয়াছি, কেহ বা বৈষ্ণবদিগের শ্রীগৌরাঙ্গকে স্থান দিয়াছি, সকল সাধুর গুণ বর্ণনা করিয়াছি, ভক্তি দিয়া সঙ্গীত করিয়া সকলের সম্মান রক্ষা করিয়াছি, অন্য ধর্ম্মাবলম্বি-গণের সঙ্গে বন্ধু ভাবে মিলিত হইয়াছি, ইহাতে আমরা স্বর্গে পরিগৃহীত পৃথিবীতে সম্মানিত কেন হইব না? বল তোমরা পরম প্রভুকে সর্ব্বোচ্চ স্থান অর্পণ করিয়া একাধারে তিন সাধুকে বসাইয়াছ কি না? দেখাও দুই হাতে ঈশা ও চৈতন্যকে স্থাপন করিয়াছ কি না? যেখানে দুই জন দাঁড়াইয়াছেন, সেখানে অন্য পাঁচজনের স্থান হয় কি না? তোমাদের সহধর্ম্মিণী ভ্রাতা ও সন্তানবর্গকে তোমার এই পথে আনয়ন করিয়াছ কি না? আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সকল ইহার অনুসারী হইয়াছে কি না? যদি সকলকে নূতন বিধানের ভাব দিতে অক্ষম হইয়া থাক, স্থির হও, স্বর্গের দ্বার খুলিবার সময় হয় নাই। এখনও মরিবার সময় দূরে। দাঁড়াও, পৃথিবী দিবে না। ঈশ্বরের পুণ্যকার্য্য সমাধা করিতে অনেক বাঁকি আছে। তোমরা যথাসময় আসিয়াছ, কিন্তু তোমাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য এখনও তোমরা কর নাই। যে জন্য আসিয়াছ তাহা সমাধা করিয়াছ কি না অন্তর্য্যামী জানিতেছেন। কার্য্য শেষ হয় নাই, এখনও দিন আছে, শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য শেষ কর। কার্য্য শেষ করিয়া গেলে স্বর্গের দ্বার আপনি খুলিবে। হে প্রসন্ন ভক্ত, প্রসন্ন মনে তোমার কর্ত্তব্য সমাধা কর, কর্ত্তব্যে অবহেলা করিও না, যাহা অসমাপ্ত আছে, তাহা সমাপ্ত কর, অপূর্ণ ব্রত সম্পূর্ণ কর। তোমার অদৃষ্টে কি আছে, কি লইয়া তুমি আসিয়াছ, ফল দেখাইয়া তাহা সকলের গোচর কর। তুমি কি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য পৃথিবীতে বাঁচিয়া আছ? তুমি কি নূতন ধর্ম্ম পৃথিবীকে দিবার জন্য আসিয়াছ, অথবা দু পাঁচ টাকা অর্জ্জন করিয়া অপরের হিতসাধন করিবার জন্য তোমার জন্ম? যদি কোন প্রকারে পরের একটু হিতসাধন করা তোমাদের কার্য্য হয়, তবেতো আদর্শ পূর্ণ হইল না। সংসারে প্রভুকে তুষ্ট করিলে, পাঁচখানা পুস্তক লিখিলে, সংসারে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিলে, ইহাতে যদি তুষ্ট হও, কপালের লেখা কেহ বলিবে না। তুমি অন্য লোকের মত নও,

তোমাকে বিশেষ বিধি স্থাপন করিতে হইবে। তুমি বিধি স্থাপনের সঙ্গে এমন কিছু কর যাহাতে লোকে বুঝিতে পারে, নববিধান কি? এমন কার্য করিয়া যাও, যাহা ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় নাই. পৃথিবীতে কেহ কোন দিন করিতে পারে নাই। আনন্দময়ী মাতার বিধান যে আসিয়াছে তাহা পৃথিবী জানিতে পারে নাই, শীঘ্র যাহাতে সকলে জানিতে পারে তাহার চেষ্টা কর। পাপ করিয়া অধর্ম্ম করিয়া সকলে বিনাশের পথে যাইতেছে, যাহাতে তাহারা রক্ষা পায় এজন্য নূতন নূতন ব্রত গ্রহণ কর। যাহার জন্য আসা, সর্ব্বপ্রযত্নে কায়মনোবাক্যে তাহা সমাধা করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া যাও। প্রভু যে পাঁচটি কার্য্য, যে পাঁচটি মিষ্ট নাম পৃথিবীতে বিলাইতে দিয়াছেন, জীব সকল যাহাতে তাহাতে বিশ্বাসী হয়, তাহার উপায় কর, পৃথিবীকে হরিভক্ত প্রস্তুত কর। এখন বলিতে পার না যে মরিবার সময়ে বলিয়া যাইতে পারিবে যাহা করিতে আসিয়াছিলাম তাহা সম্পন্ন করিয়া চলিয়া গেলাম। ভ্রাতৃমণ্ডলী, এই সময় আর সময় নাই। যে কয় বৎসর আছ, ইহার মধ্যে কার্য্যসাধন করিয়া যাও। উৎসাহ আনন্দের সহিত নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সমাধা করিয়া পরম প্রভুকে সন্তুষ্ট কর যে, পুরস্কারের উপযুক্ত হইবে।

রাজা রামমোহন রায়।

রবিবার, ১৮ পৌষ ১৮০৩ শক।

অদ্য হইতে ব্রহ্মমন্দিরে সাংবৎসরিক ব্রহ্মোৎসব আরম্ভ হইল। উৎসবে যে আনন্দের হিল্লোল পরে দেখিতে পাইব তাহার প্রবল উচ্ছ্বাস আজই দেখিতেছি। ব্রাহ্মেরা উৎসবের উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন, প্রস্তুত হইবার প্রথম দিন অদ্যকার দিন। যদি সকলে মিলিত হইয়া, উপদেষ্টা ও উপদিষ্ট একত্র হইয়া এক সরল পথে না যান তবে সমুদায় উদ্যোগ বৃথা। সর্ব্বপ্রথমে এক ভূমি পরিষ্কার করিয়া এক পথে চলা কঠিন। উপদেষ্টা যাহা বলেন সাধারণের মধ্যে সকলে তাহা গ্রহণ করেন না। তিনি যে ভাষায় উপদেশ দেন, তাঁহারা ভিন্ন ভাষায় সেই কথা বলেন,

উভয়ের মধ্যে প্রভেদ অনেক। ভাবসম্বন্ধে ব্যবধান তো অতি প্রশস্ত। বক্তা যে সকল কথা বলেন অধিকাংশ শ্রোতা সে সকলেতে গভীর ভাবে যোগ দেন না। অধিকাংশের আবিষ্কৃত বিষয়ে যোগ দিতে অমত। আমাদিগের মধ্যে মতের অনৈক্য আছে। উৎসবসম্বন্ধে আমার বিনীত প্রার্থনা ও প্রস্তাব এই যে আমাদিগের মধ্যে ভাষা ও ভাবের ঐক্য হউক। অনেকে বলিয়া থাকেন রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপন করিলেন। এই ঘটনা স্বীকার করিতে গিয়া এই যে ভাষা ব্যবহৃত হইল ইহা অতি অপবিত্র এবং হীন। স্পষ্টরূপে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের বেদী এই কথা বলিতেছে এই হীন ভাষার মধ্যে লুক্কায়িত প্রবলতর হীন ভাব ও হীন মত আছে। এ সময়ে সকল প্রকারের হীন ভাব হীন মত বিনাশ করা উচিত। নতুবা যোগ দিলে ফললাভে বঞ্চিত হইতে হইবে। এক জন মানুষ এই ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিলেন, এ কথা শুনিতে ভয় হয়. এ অতি দুর্গন্ধ বস্তু ইহা দ্বারা ঘৃণা উদ্দীপ্ত হয়, মনের মধ্যে এ অতি কাঁচা কথা বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। এ অতি অবিশ্বাসের কথা। ইহার ভিতরে প্রকাণ্ড অকল্যাণের হ্রদ লুক্কায়িত আছে। যদি সাবধান না হও, এই হ্রদের ভিতরে ডুবিয়া মরিবে। যখনি কোন সাংবৎসরিক উৎসব হয় তখনি যিনি সমাজসংস্থাপক তৎপ্রতি সম্মান ও আদর প্রকাশ করা হয়। ব্রাহ্মগণও সেই উদ্দেশ্যে উৎসব করিয়া থাকেন। সকল সমাজেরই উৎসবে সংস্থাপককে মর্য্যাদা দেওয়া আচারসঙ্গত। এই জন্য বলিতেছি উৎসবের আদি বর্ণ সংস্থাপকসম্বন্ধের ঘটনা। এ ঘটনা পর্য্যালোচনা করিয়া সর্ব্বাগ্রে মত স্থির করা উচিত। আমি মনে করি, উচ্চতর বিধান গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুতির সময়ে ব্রাহ্মসমাজ বিধান সমাগত হয়। যখন ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সূত্রপাত হইল তখন বিধানের বাদ্য বাজিল। তোমরা ৫০ বৎসর রামমোহন রায়কে সংস্থাপক বলিতে সাহসী হইলে, তোমরা পৃথিবীর ভাষায় এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করিলে। আমি বিনীত ভাবে এই কথার প্রতিবাদ করিতেছি। পূর্ব্বের ন্যায় আর যে এই ঘটনাকে পার্থিব দৃষ্টিতে দেখা হইবে তাহার সময় চলিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলিবেন পূর্ব্ব হইতে যাহা চলিয়া আসিয়াছে চিন্তা করিয়া

তাহার প্রতিবাদ করা উচিত। বর্ত্তমান সংশয়বাদের সময় সুতরাং আশঙ্কা করিবার কারণ আছে, কেন না সামান্য লোকেরা বিধান বলিয়া কখন স্বীকার করিবে না। যখন বিধান সত্য, তখন বিধানকে বিধান বলিবে তাহাতে কথা কি ? পুরাতন পুস্তকে এ সম্বন্ধে যে অশুদ্ধি আছে তাহা শোধন কর। সেই সকল পুস্তকে লিখিয়া দাও ইহাতে অনেক ভুল আছে, ইহার সংশোধন আবশ্যক। ইতিবৃত্ত পাঠ করিতে গিয়া যাহাতে ভ্রান্তি না হয়, তাহা হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া পাঠ করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে কি আপ্তবাক্য আছে তাহা শ্রবণ কর। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এক দিন ঈশ্বর আপনার সন্তান রামমোহনকে ডাকিয়া বলিলেন "কাছে এস। তোমাকে দাসের কার্য্য করিতে হইবে। দেখ ভারতবর্ষ অন্ধকার, কুসংস্কার, পৌত্তলিকতাতে পূর্ণ হইয়াছে, উহারা ভারতসন্তানগণের প্রাণ নাশ করিতেছে। ভারতে গৃহধর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায়। সংসারের ভিতরে অসুরের অত্যাচার বাড়িয়াছে। পাপ দুষ্প্রবৃত্তি নাস্তিকতা অপরাধ আস্ফালন করিতেছে, নরনারীর প্রতি প্রবল বিক্রম প্রকাশ করিতেছে, অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। যাও, বঙ্গদেশে মাতৃগর্ভে গিয়া জন্মগ্রহণ কর। জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত হইয়া উপযুক্ত সময়ে ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হইবে। পৃথিবীতে তোমার শত্রু বাড়িবে, কিন্তু তাহারা তোমার কি করিবে ? শাস্ত্রিগণ তোমাকে আক্রমণ করিবে, তোমার নামে কত অপবাদ করিবে, বন্ধুবান্ধব পর্য্যন্ত তোমাকে পরিত্যাগ করিবে কিন্তু তুমি কোন ভয় না করিয়া এই বলিবে, 'প্রাচীন শাস্ত্রে কেবল এক ঈশ্বর, পৌত্তলিকতা আধুনিক।" বিধাতা এই কথা বলিয়া তাঁহাকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন, এ কথা বলিয়া যত উৎসব হয় হউক, বিধানের জয় কীর্ত্তিত হউক, পবিত্র ঈশ্বরের গৌরব বঙ্গদেশে মহীয়ান্ হউক ! আমরা সাহসভরে এই কথা বলিতে থাকি যাহা হয় হউক ; পরে কি হয় দেখিতে পাইব। ব্রহ্মের আজ্ঞা মস্তকে ধারণ করিয়া রামমোহন যাহা করিয়া গেলেন তাহা অতি অদ্ভুত। তিনি একজন প্রেরিত ধর্ম্মসংস্কারক যিনি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া পৃথিবীতে ধর্ম্মসংস্থাপন করিলেন; ব্রহ্ম যাঁহার দ্বারা তাঁহার ধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। নীচ পৃথিবীর ভাষাতে লোকে তাঁহাকে যখন ব্রাহ্মসমাজ

সংস্থাপক বলিবে, তখন কি বলিবে? তখন কি বলিবে যে একজন মনুষ্য নিজ বুদ্ধিতে নিতান্ত প্রবল ছিল, সে ব্যক্তি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বুদ্ধিবলে জ্ঞানবলে শাস্ত্র নির্ব্বাচন করিয়াছিল। বেদান্ত হইতে মত উদ্ভাবন করিয়া দেশীয় বন্ধু বান্ধবের নিকট প্রকাশ করিল। তিনি কি লোকাতীত বলে আপনার ধর্ম্ম মতকে বিজয়ী করেন নাই? তিনি উপনিষৎ পুরাণ প্রভৃতি সমালোচনা করিয়া ধর্ম্ম স্থাপন করিলেন, একথা বলিয়া কি হইবে? স্বর্গে একখানি ধর্ম্মপুস্তক আছে, তাহার একটি স্বর্গীয় শব্দের বর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়া পার্থিব শব্দে উহাকে লোকের নিকটে প্রকাশ করিতে চাও। বিধান শব্দকে তুমি স্থাপনা শব্দে পরিবর্ত্তন করিতে উদ্যত। তুমি আপনার হস্তে ঈশ্বরের শাস্ত্র কাটিলে, সংস্কৃত ভাষার পরিবর্ত্তে চণ্ডালের ভাষা ব্যবহার করিলে। অন্ধ বিশ্বাসীর নীচ হীন ভাষায় বড় বড় শব্দ পরির্ত্তন করিলে। যাহা ছিল মহৎ তাহা নীচ হইল। কোথায় দেবতারা হাসিবেন, না শয়-তানের বংশ হাসিল। যাহা বিধান, তাহা হইল মানুষের মত, যাহা ছিল ব্রহ্মের শক্তি তাহা হইল মানুষের বুদ্ধিবল। যে গ্রন্থ স্বর্গ হইতে পড়িল, তাহা কি না প্রথমতঃ পৃথিবীতে লিখিত ও রচিত হইয়া যোড়াসাঁকো যন্ত্রালয় হইতে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। এ সকল অজ্ঞানের কথা। ঈশ্বরের নিকট হইতে এক জন প্রেরিত আসিলেন। যিনি প্রেরণ করি-লেন তাঁহাকে সরাইয়া আমরা প্রেরিতকে তাঁহার পদে স্থাপন করিলাম। পরিশেষে আমাদিগের মধ্যে কি মৃত ব্যক্তির পূজা স্থাপিত হইবে, নীচ হীন ভাষা স্থান পাইবে? ১১ই মাঘের সময় রামমোহন রায় সংস্থাপক বলিয়া চীৎকার করিবে? কে রামমোহন রায়? প্রাণ থাকিতে তাঁহাকে স্বীকার করিব না। রামমোহন রায় কি বস্তু কি পদার্থ? কে ছিল সেই লোক চিনি না। যাঁহারা আমাদের লোক তাঁহারা তাঁহাকে চেনেন না। তিনি কলিকাতার কি বঙ্গ দেশের ইহা বলিয়া তাঁহার সঙ্গে কোন পরিচয় নাই। তাঁহাকে আমরা দেখিও নাই, স্বীকারও করি না। ভক্তি দেখাইতে হইলে আমরা এক ব্যক্তিকে দেখাইব যিনি প্রেরিত ছিলেন। তিনি কোথায়? মনে কর তিনি যেন হিমালয়ে, তাহাতে কি? আমি পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তো জন্মগ্রহণ করি নাই। সে সময়ে ঈশ্বর কোন

সন্তানকে প্রেরণ করিলেন, তাঁহার দ্বারা কিছু করাইয়া লইলেন, ইঁহা কি প্রকারে বিশ্বাস করিব ? মনের দ্বারা কি প্রকার নিশ্চয় করিব যে কোন এক জন প্রেরিত পঞ্চাশবৎসর পূর্ব্বে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন ? ব্রাহ্ম নিরুত্তর। প্রেরিত ? প্রেরিত মানি না। ঈশ্বর কাহাকেও প্রেরণ করেন না। বীজ হইতে যেমন গাছ উঠে, মানুষ তেমনি উঠে। স্বাভাবের নিয়মে ঘটনা সকল ঘটিতেছে। উদ্ভিদ রাজ্যে যেমন উত্থান ও বৃদ্ধি, মনুষ্য সমাজেও তেমনি চারাগাছ বড় হইল, ফলফুল পত্রে শোভিত হইল। মানুষ বালক ছিল যুবা হইল, যুবা ছিল বৃদ্ধ হইল। সকলই নিয়মে হইতেছে। আকাশ হইতে আবার নামিল কে ? যদি স্বর্গ হইতে কেহ না আসিলেন তবে এ সকল ব্যাপার কি প্রকারে ঘটিল ? এ সকল কি মানুষের কীর্ত্তি ? এ সকল কি ঈশ্বরের হস্তের শাস্ত্র নয় ? ঈশ্বরের বিশ্ব ঈশ্বরের মন্দির কি এক নয় ? ঈশ্বরের গৃহ কি মনুষ্য নির্ম্মাণ করিল ? বুঝিতে পারি না। মানুষ ধর্ম্মসংস্কারক হইল, ব্রহ্মসভা করিল, মানুষ কতকগুলি মত উদ্ভাবন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থাপন করিল, এ কথা আমরা বলিতে পারি না। আমরা প্রেরিত মানি, এ সকল ব্যাপারে ব্রহ্মের হস্ত দর্শন করি। ক্ষমা কর, যেখানে মানুষের ক্ষমতা প্রকাশ, আমরা তাহাতে যোগ দিতে পারি না। ঈশ্বর প্রেরণ করেন এবং যিনি পিতা মাতা দত্ত রামমোহন নামে পরিচিত হইলেন তাঁহার যদি শ্যাম নাম হইত কিছু ক্ষতি নাই। নামসম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। যিনি প্রেরিত তাঁহাকে যে আখ্যা দেওয়া হউক, সেই আখ্যায় তিনি পৃথিবীতে পরিচিত হয়েন। চিদাত্মা ব্রহ্মতনয় ব্রহ্মনিয়োজিত, ব্রহ্মপ্রেরিত। এমন যদি কেহ থাকেন তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি আমাদিগের মধ্যে যশস্বী হইবেন। গোড়া ঠিক্ না করিয়া প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া কাহার নাম কীর্ত্তন করিব ? কাহাকে সম্মাননা দিব ? কি জানি শেষে যদি বড় জ্ঞানে কোন মানুষকে পূজা করিয়া ফেলি ? এরূপ করিতে গিয়া উৎসব পুস্তকের প্রতিপাতায় আমাদের দুষ্ট ব্যবহার লিপিবদ্ধ হইবে, যাহা করিব সকলই মিথ্যা হইবে সর্ব্বনাশ হইবে, মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে হইবে। সাবধান, উৎসব মনুষ্যের স্মরণার্থ নয়, মনুষ্যের গুণকীর্ত্তন করিবার জন্য

নয়। উৎসব কি জন্য? ব্রহ্মের কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, উন্মত্ত হইয়া ঈশ্বরের জয় ঘোষণা করিবার জন্য, ঈশ্বরের গৌরবে লোককে মহৎ করিবার জন্য। উৎসব আর কিছুর জন্য নয়, ইহার জন্য। ইহার প্রথম অক্ষর বিধান, ইহার প্রত্যেক বর্ণ বিধান, ইহার শেষ মন্ত্র বিধান। সর্ব্ব প্রথম বিধান রামমোহনে প্রকাশ পাইল, তিনি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলেন। তিনি একটী প্রণালী হইয়া এই কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তাই লোকে বলে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপক। সমাজস্থাপন সমাজপ্রতিষ্ঠা এ কি একটি বিদ্যালয় স্থাপনের ন্যায় মানুষের কীর্ত্তি? আমরা সভা করিয়া সাংবৎসরিক করিয়া কি সেই মানুষের কীর্ত্তি ঘোষণা করিব? এতো সামান্য বিষয় নয়, এ যে দেশব্যাপক পরিত্রাণের ব্যাপার। মনুষ্যের যাহা প্রাপ্য নয় তাহাকে তাহা অর্পণ করা কেন? ঈশ্বর বিধান করেন। মানুষকে তিনি সেই বিধানের বাহক করেন। বঙ্গদেশে তিনি রামমোহনকে পাঠাইলেন। বঙ্গদেশী চাহিল, অশ্রুজলে ভাসিয়া ভগবানের নিকটে গিয়া দুঃখ জানাইল, ঈশ্বর জীবের দুঃখ দেখিতে পারেন না, অন্ধকার সহিতে পারেন না, তাই তৎক্ষণাৎ একজ্যোতির্ম্ময় পুরুষ প্রেরণ করিলেন। তাঁহারই উপরে তোমার আমার ভার ছিল। তিনি দুর্ব্বল ছিলেন না, অন্যান্য ধর্ম্মবীরের ন্যায় ছিলেন। তুমি তাহার বিচার করিবে? তোমার জননী কি তোমা অপেক্ষা জ্ঞানী নন? তুমি কি বলিবে, আমি প্রেরণ করিলে প্রবলতর সিংহের মত পরাক্রমশালী আরো বড় লোক পাঠাইতাম। তোমার এ কথার এক সদুত্তর এই, তোমার জ্ঞানের কথা রাখিয়া দাও। আমরা বিধান মানি, যেমন রাক্ষস তেমন বীর, যেমন রোগ তেমনি ঔষধ, যেমন অজ্ঞানতা তেমনি প্রকাণ্ড শাস্ত্র। বুদ্ধিবলে সমুদায় কুতর্ক ছেদন করিতে পারে, সমুদায় ভ্রান্তি ছিন্ন করিতে পারে, এমন এক জনের অবতরণের প্রয়োজন ছিল। যেমন প্রয়োজন ঘটনা তদ্রূপ। ঔষধ রোগযন্ত্রণার অনুরূপ। লোকে যাহা বুঝিতে চায় তাহা বুঝাইতে পারে তেমনি লোক, তেমনি কৌশল। আমাদিগের পুস্তক সকলের মধ্যে একেশ্বরবাদ আছে কি না, এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য সহজে বুঝাইবার জন্য তিনি আসিলেন। উপনিষৎ পুরাণ হইতে চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে

যে ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল, সেই ওঁকার পুনঃসংস্থাপন করিলেন। আমাদিগের দেশীয় শাস্ত্রে যে বড় বড় কথা মহারণ্যের মধ্যে পড়িয়াছিল, তৎসমুদায় উদ্ধার করিলেন। সমুদায় বিরুদ্ধবাদিগণকে নিরস্ত করিয়া সত্য উদ্ধার করিলেন, দেশীয় ভ্রাতাদিগকে সৎপথ দেখাইলেন। তিনি জ্ঞানের গুরু ভক্তি বা কর্ম্মের গুরু ছিলেন না। সমুদয় ভক্তদল লইয়া মৃদঙ্গ বাজাইয়া ভক্তির পথে যাইবেন এ জন্য তিনি আইসেন নাই। যাঁহার যে কার্য্য তাহার জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হও। নতুবা ধর্ম্মে ব্যভিচার আসিবে। তোমার মতে বিদ্যা বুদ্ধি বিচার পরিত্রাণ করিতে পারে না। এ কথা বলিও না, ঈশ্বর কি দিলেন, বিচার করিও না। যাহা তিনি প্রেরণ করিলেন, যাহা তিনি দিলেন তাহা ভাল, তাহাই অমূল্য রত্ন। যাহা তিনি দিলেন মস্তক পাতিয়া গ্রহণ কর, কৃতজ্ঞ হইয়া ভক্তির সহিত স্বীকার কর। বলিও না তিনি ইটি দিলেন ইটি দিলেন না কেন? যে জন্য তিনি আসিয়াছিলেন সমুদায় অত্যাচার ঘৃণা নিন্দা ধৈর্য্যের সহিত বহন করিয়া তাহা সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। সভ্যতা, বিদ্যা, জ্ঞানের দুর্জ্জয় দুর্গমধ্যে তিনি সত্যের আলোক প্রকাশ করিলেন, ঈশ্বরের গৌরব স্থাপন করিলেন। কৃতবিদ্যেরা তাঁহার নাম শুনিয়া বিকম্পিত কলেবর হন। এত সামাজিক উন্নতি হইয়াছে, এত বিদ্যা বুদ্ধি বাড়িয়াছে, অনেক পণ্ডিতও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার মত একজনও হয় নাই। ইহাতেই প্রমাণিত হইল, তিনি ঈশ্বরপ্রেরিত, স্বর্গের লোক। এখন বিদ্যাচর্চ্চা বাড়িয়াছে, অনেকে এদেশ হইতে ইংলণ্ডে যাইতেছে। কিন্তু আজও রাজনীতি সংশোধনের জন্য তাঁহার মত ইংলণ্ডের মহাসভায় আর কেহ আন্দোলনা করিতে পারেন নাই। বড় বড় পণ্ডিত বিদ্বান বুদ্ধিমান্ দিগ্বিজয়ী লোক তাঁহাকে আক্রমণ করিল, এক এক করিয়া তিনি সকলকে পরাজয় করিলেন, কেহই বিপক্ষতাচরণ করিয়া কিছু করিতে পারিল না। ধনী মানী জ্ঞানী নীচ, সকলে খড়্গহস্ত হইল, তিনি একাকী পৌত্তলিকাতার বিরোধে দণ্ডায়মান হইলেন, তাঁহার প্রবল বাহুবলের নিকটে সকলে পরাজয় স্বীকার করিল। তাঁহার উপরে হস্তক্ষেপ করিও না, সাবধান, রামমোহনের জীবন সামান্য জীবন নহে। সে সময়ে তাঁহার মতন কেহ ছিল না, এখন অনেক বিদ্যা বুদ্ধি

বাড়িয়াছে তথাপি কেহ তাঁহার সমান হইতে পারে না. তিনি একা দিগ্‌বিজয় করিলেন, এ কথায় কি বল ? বিধানের বিরোধিগণ কি বল ? অবশ্য বিধাতার বিধান মানুষের নয়। স্বীকার কর, ঈশ্বর যে জন্য তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন তাহা তিনি করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত লেখ কিন্তু জানিও মানুষ সে বাড়ী নির্ম্মাণ করে নাই, মনুষ্য ইহার স্থাপন করে নাই। তবে কি উপকারী বন্ধুকে দূর করিয়া দিবে ? কোন মনুষ্য কি উপকার করে নাই ? মানুষের কথা কেন বল ? বল স্বর্গে পূর্ব্বে ব্যবস্থা ছিল, তাই রামমোহন আসিলেন, তোমাদের কার্য্যসিদ্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন। তিনি স্বর্গের ব্যবস্থানুসারে আসিলেন, বজ্রধ্বনিতে একথা ঘোষিত কর। সেই সময় বিধান হইল, আজ আমরা তাহাকে বিধান বলিয়া ডাকিতেছি। তোমাদের ভাষাতে বলিলে নূতন বিধান, নূতন ভারত। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কোন বুদ্ধিমান্‌ব্যক্তি বিশেষ যত্নে যাহা সংস্থাপন করিলেন, তৎপর সময়ে আবার আর একজন তাহা রক্ষা করিলেন, সকলকে একত্র করিয়া সমাজগঠন করিলেন, এ সকল কথা গল্প। এ সকল মিথ্যা কথা এ সকল ভুলিয়া যাইতে হইবে। নূতন কথা বলিয়া ভণ্ডামর কথা বলিয়া কাটাইতে চাও কাটাও, এ সত্য-জ্যোতি ভাঁটার মত গড়াইয়া গড়াইয়া আসিতেছে, আজ না বলিলে পৃথিবীকে এক দিন প্রেরিত বলিতেই হইবে। তবে আর বিলম্ব কেন ? এখন আর ধর্ম্মস্থাপনের কথা না বলিয়া বিধানের ভাষায় সমুদায় ঘটনা ঈশ্বরের মঙ্গল হস্তের ব্যাপার বল। তোমার বাড়ীতে যত শুভ ঘটনা ঘটিতেছে সকলই বিধাতার বিধান। আজ যে জয় পতাকা উড়িতেছে, আজ যে বিধানের মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে, অতি প্রথমে সেই ওঙ্কারের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ছিল। শুভক্ষণ আসিয়াছে, আর গৌণ নাই। এখন নিরাশ হইবার বিষয় নহে, এখন আর প্রাচীন ভাষা কেন থাকিবে ? তখনকার ঘটনা আর এখনকার ঘটনা আমরা ভাবিব ? সমুদায় বিধান এক রাজ্যের ঘটনা। ঈশ্বর যাহা করিতেছেন, আজ পর্য্যন্তও তাহার শেষ হয় নাই, আরো এই বিধান গঠন হইতে থাকিবে। পৃথিবীর ভাষা ছাড়িয়া বিধানের এই ভাষা অবলম্বন কর। একই ভাষায় বিধাতার বিধানের গুণ কীর্ত্তন করিতে থাক। তাহা হইলে প্রেরিত সাধুগণের সঙ্গে বর্ষে বর্ষে তোমাদের

অনন্তর যোগ নিবদ্ধ হইবে, কল্যাণের উপর কল্যাণ বর্দ্ধিত হইবে, ঈশ্বরকে বিধাতা বলিয়া কৃতার্থ হইবে, মঙ্গলময় বিধাতার বিধানে তোমাদিগের হৃদয় মন সুখী হইবে।

সাধু সম্মান।

রবিবার, ২৫ পৌষ ১৮০৩।

এক ঈশ্বরের মহিমা ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন হইয়া অবধি মহীয়ান্ করিতেছেন, এবং জাতিভেদ অস্বীকার করিয়া, বর্ণভেদ অতিক্রম করিয়া সমস্ত জীবের মধ্যে প্রেম ও ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ স্থাপন করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের এই দুই লক্ষণ, এই দুই কীর্ত্তি সকলেই জানিতেছে। ইহার ধর্ম্মের মূল মত, ঈশ্বরকে পিতা, ও মনুষ্যকে ভ্রাতা বলিয়া গ্রহণ করা। মানুষ ভাই, ঈশ্বর পিতা, এ দুই মতের মধ্যস্থলে আর কোন কথা আছে কি না, এ বিষয় লইয়া এত দিন আলোচনা হয় নাই; সম্প্রতি হইয়াছে। ইটিই নূতন মত, ইহাই প্রাচীন ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ভক্তির নূতন মত পুরাতনের মধ্য হইতেই বাহির হইয়াছে। ঈশ্বরকে যদি ভাল বাসি পিতা বলিয়া, মানুষকে ভাল বাসিব, ভাই বলিয়া। গুণাধিক্য বশতঃ ভাই জ্যেষ্ঠ হইতে পারেন, গুণের ন্যূনতা বশতঃ ভাই কনিষ্ঠ হইতে পারেন। যে পরিবারে ভাই আছে, সে পরিবারে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠও আছে। এই তারতম্য কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। সকলে এক, এ কথা মানি না; সমান পরিমাণে সকলেই প্রেম ভক্তি সুধা পান করিয়াছেন, এ কথা অমরা মানি না, বড় ছোট আমরা মানি। ইনি বড়, না ইনি ছোট? ভক্তি দিব, না স্নেহ দিব? ভক্তি ঊর্দ্ধগামী; যদি বড় হন ভক্তিই দিব, স্নেহ দিব কিরূপে? জ্যেষ্ঠ ভাইকে ভক্তি দিলে পিতাকেই ভক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে ঈশ্বর সোপান; সাধুরা গম্যস্থান। অন্যান্য সম্প্রদায়ে সাধু সম্মান না করিলে, ভক্তকে উপযুক্ত মর্য্যদা না দিলে, ঈশ্বরের সম্মান করা হয় না। নব বিধানের নব মত এই যে, ঈশ্বর যদি জ্যেষ্ঠ না দেখান, আমরা জ্যেষ্ঠকে দেখিতে পাই না। কে জ্যেষ্ঠ,

কেন হইলেন জ্যেষ্ঠ, পিতা ভিন্ন এ গূঢ় রহস্য আর কেহই জানে না। কে বড়, জানিব কিরূপে? বড় জানা ও বড় হওয়া একই। সে উচ্চ জ্ঞান কোথা হইতে আসিবে? সাধুকে চিনিয়া শ্রদ্ধা দেওয়া সাধুর পক্ষেই সম্ভব। সাধুরা আপনাপনি আপনাদিগকে বোঝেন। যাঁহারা সাধু নন তাঁহারা সাধু চিনিবেন কিরূপে? দেখ ঈশ্বর জানা সহজ; কিন্তু সাধু জানা কঠিন। এমন সম্প্রদায় আছে যাহার লোকেরা অন্যান্য ধর্ম্মের সাধুদিগকে অতিক্রম করিয়া তাঁহাদিগকে অপমান করিয়া, কেবল আপন সম্প্রদায়ের সাধুদিগকেই ভক্তি করিয়া থাকে। আমাদিগের মধ্যে এত দিন কিরূপ বোধ ছিল? সাধুদিগের নিন্দা করিতে পারি, অথচ ঈশ্বরের প্রশংসা করিতে পারি; বড়দের গালি দিতে পারি, সেই মুখে আবার কীর্ত্তন করিতে পারি। আর কিছু দিন সেই বোধ থাকিলে ভয়ানক ব্যাপার হইত। এখন নূতন মত প্রকাশিত হইয়াছে, ভক্তের অপমান করিলে ঈশ্বরের অপমান করা হয়। বুঝিলাম, ঈশ্বর স্বয়ং সাধুদের মান্য দেন, তিনি স্বয়ং তাঁহাদিগকে লোকের শ্রদ্ধাভাজন করিয়া দিবার চেষ্টা করেন, স্বয়ং সাধুদিগকে গৌরবের মুকুট পরান। যখন ঈশ্বরের নাম করিয়া নগর কীর্ত্তন আরম্ভ করিলাম। ধূলিতে অবলুণ্ঠিত হইলাম তখন, সেই ভক্তির ভিতরে আর সাধুর অপমান হইতে পারে না। ঈশ্বর তখন সাধুর মধ্যে দেখা দিলেন কি ভাবে? ভক্তের আকার ধরিয়া; একটি গুণ, এ সাধুতে আর একটি গুণ ও সাধুতে রাখিয়া। ইহুদীদিগের সাধুতে একটি লক্ষণ, ঈশার মধ্যে ব্রহ্মস্বরূপের আর একটি লক্ষণ। বুদ্ধদেবের মধ্যে এক নির্দর্শন, চৈতন্যেতে আর এক নিদর্শন। তেমার আমার গুণে কি ব্রাহ্মসমাজে সাধুভক্তি হইল? তাহা কখনই হইতে পারে না। তিনি নিজে ভক্তদিগকে বেশ মধ্যে দেখা দিলেন। যিনি দেখাইলেন, একমেবাদ্বিতীয়ং তিনি। এক তিনি, নির্লিপ্ত তিনি। বিশেষ বিশেষ চরিত্রখণ্ড বিশেষ বিশেষ সাধুতে। উপাসনা করিতে করিতে জ্ঞানচক্ষুতে দেখিতে পাইলাম, ঈশ্বরের পশ্চাতে দক্ষিণে, বামে, সারি গাঁথা লোক। এরা কে? এ লোকেরা কে? আমরা ত প্রেতবাদী নই, তথাপি দেখি, সারি গাঁথা ভক্তগণ। সাধুগণ ব্রহ্মে লিপ্ত; তিনি যেমন সাধুতে; সাধুরা তেমনি তাঁহাতে। সাধনে ইহা উপলব্ধি হয়। ঈশ্বরকে প্রেমরজ্জুতে বাঁধা দেখিতে পাই, সাধুসঙ্গে সাধু-

বৎসলকে ভক্ত সঙ্গে ভক্তবৎসলকে। সেই প্রেমরজ্জুকে ছিঁড়িতে পারিয়াছে? সে রজ্জু কোনক্রমেই ছিন্ন হয় না। যেমন ঈশ্বরের সমাগম, অমনি সঙ্গে সঙ্গে সাধুদিগের সমাগম। সাধুরা বাস করেন ঈশ্বরের মধ্যেতে ঈশ্বরেতে লিপ্ত হইয়া। যখন এই প্রকার সাধন সিদ্ধ হইল, সাধু সমাগম নিশ্চয় হইল, তখন সকল উৎসবে, সাধুদিগকে সম্মান দেওয়া আবশ্যক হইয়া আসিল, মতের আকার ধরিল। বুদ্ধির দ্বারা পুস্তকের সাধুকে আমরা লই না। আমরা সাধুর দোষগুণ বিচার করিব, তা নয়। সাধুসম্মান আমাদিগের স্বতন্ত্র বিশেষ মত নয়। ঈশ্বর স্বতন্ত্র সাধু স্বতন্ত্র, এভাবে সাধু সম্মান দিব না। ঈশ্বরের প্রকাশ সাধুতে। এমন সাধন সম্ভব নয় যে সাধুকে কাটিয়া ফেলিব আর ঈশ্বরকে রাখিয়া দিব। ঈশ্বরের রক্ত সাধু। ঈশ্বর বলেন, আমি ভক্তেতে অবস্থান করি। সাধুদিগকে প্রথমেই একেবারে তিনি ব্রাহ্মসমাজের হস্তে দেন নাই। ঈশ্বর বলিলেন দেখিব ব্রাহ্মসমাজ অপনা আপনি সাধুদিগকে গ্রহণ করে কি না? প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইলেন, স্বভাবের নিয়মে অপনা আপনি সাধু সকল বাহির হইলেন। ব্রহ্মাণ্ড প্রস্ফুটিত হইল। হরি যে অণ্ড রাখিয়াছিলেন, তাহা যত প্রস্ফুটিত হইল, ততই নারদ কবীর, ঈশা, মুষা, শ্রীচৈতন্য সব বাহির হইলেন। ঈশ্বর যে বীজ পুতিয়াছিলেন, রামমোহন রায় না জানিয়াও যে বীজে জল সেচন করিয়াছিলেন, সেই বীজ অঙ্কুরিত হইল। দিন দিন তরু বাড়িতে লাগিল, সতেজ হইল, ফুল দেখা দিল, ফল হইল, বিচিত্র বর্ণের পল্লব সকল শোভা বিস্তার করিল। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!! যেখানে ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মনুষ্যের ভ্রাতৃত্বের মত প্রতিষ্ঠিত, সেখানে সাধুসম্মানের ভাব অনিবার্য্য। কে গৌরাঙ্গকে ডাকিয়াছে? কে বুদ্ধ দেবের পুস্তক পড়িয়া বুদ্ধদেবকে লইতে গিয়াছে? কে ঈশাকে আহ্বান করিয়াছে? সকলই আমরা ঈশ্বরের উপাসনা করিতে করিতে পাইলাম। ব্রহ্মোপাসনা অতি অদ্ভুত ব্যাপার!! নিগূঢ় উপাসনা করিতে করিতে ত্রিভুবন দেখিলাম। ত্রিভুবন ত দেখিলামই, চতুর্থ ভুবনও দর্শন করিলাম। একথা আর এখন বলিতে পারি না, সমস্ত তত্ত্ব জানিয়াছি, সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান লাভ করিয়াছি। কে গৌরাঙ্গ কে ঈশা একথা আর মুখে উচ্চারণ করিতে পারি না। ঈশ্বরকে লইব,

তাঁহার পুত্রদের দূর করিয়া দিব, একথা বলিতে এখন প্রাণ কাঁদে। ঈশ্বর আসিবেন, তাঁহার সাধু পুত্র অঞ্চল ধরিয়া থাকিবেন। কোন্ মুখে বলিব, ঈশ্বর তোমাকে চাই, কিন্তু সাধু পুত্রকে কাটিয়া ফেলিব, দূর করিয়া দিব। এরূপ মনুষ্য থাকা সম্ভব নয়, যিনি বলিতে পারেন, ঈশ্বর আমার সর্ব্বস্ব, জ্যেষ্ঠ কাহাকেও বলি না, আমিই সকলের বড়; ঈশ্বরের পার্শ্বে আমি বসিয়াছি। এরূপ ভাব স্বভাবের অতীত; ব্রহ্মোপনিষদের অতীত। সাধুদিগকে আলিঙ্গন করা স্বভাবসিদ্ধ; তাঁহাদিগের যশঃকীর্ত্তন করিলে ঈশ্বরেরই যশঃকীর্ত্তন করা হয়। এই যে সাধুলোক, সাবধানে এই লোক গ্রহণ করিতে হইবে। যত দেখিবে সাধুকে আগে দেখিবে ঈশ্বরকে। সমস্ত নিশানের উপর ঈশ্বরের নিশান উড়াইবে। ' সাধুর আদর ঈশ্বরের আদরের ফল। আগে সাধু নয়, আগে ঈশ্বর, পরে সাধু। স্থান কিনিলাম হৃদয়ভূমিতে ঈশ্বরের জন্য; এক রাত্রির মধ্যে ঈশ্বর স্বয়ং সাধুদের জন্য ঘর বাঁধিয়া দিলেন। যদি ব্রাহ্ম সাধুদিগকে সম্মান করিতে গিয়া দোষ করিয়া থাকেন, সে দোষ ঈশ্বরের। বৃন্দাবন না করিয়া তিনিত থাকেন না। উৎসব যদি হয়, ঈশ্বরের জন্য যদি ঘর বাঁধিতে হয়, যদি তাঁহাকে আসিয়া দেখা দিতে হয়, তিনি দূত প্রেরণ করেন, কত স্থান লওয়া হইয়াছে, জানিবার জন্য। সমুদয় ভক্ত আগমন করিবেন, যে বাড়ী গুলি লওয়া হইয়াছে তাহাতে অত লোকের স্থান হইবে কি না? প্রেম ভক্তি যেরূপে সাজান হইয়াছে তাহাতে সব ঠিক হইবে কি না, যদি ভক্তদিগের স্থান না হয়, ব্রহ্ম আসিতে অস্বীকৃত। দেখ কি অবস্থা! সাধুর অনাদর করিলে ঈশ্বরের আসা অসম্ভব। ব্রহ্মভক্তরত্ন এখন ব্রহ্মের নিকট হইতে লইতে হইবে। ব্রহ্মভক্তরত্নকে এখন আদর করিতে হইবে। ইহা উন্নতির লক্ষণ। এখন উন্নতি হইয়াছে, তাই তিনি ভক্তকে পৃথিবীতে আনিতে চান। তাই এখন বলেন, ভক্তের স্থান না হইলে আমি যাইব না। তিনি জানেন যে, যদি এখন তিনি না আসিতে চান, আমরা কাঁদিব, বলিব যাহা চাও তাই দিব, ঈশ্বর এস। এক শত ঘর প্রস্তুত করিতে বল, তাহাই করিব; দুই হাজার ক্রোশ ভূমি লইতে বল তাহাই যোগাড় করিব, পাঁচ দিনের মধ্যে। সুখের বৃন্দাবন যেন অপূর্ণ না

থাকে। তুমি আসিবে, তোমাকে ডাকিব, আর তোমার ভক্তদের নিন্দা করিব, এ অবস্থা আর আমাদের নাই, এ কথা বলিলে ব্রহ্ম তুষ্ট হন। কিন্তু সাবধান! ভক্তের ভিতর দিয়া ব্রহ্মে যাইও না। যে ভক্তকেই মানে, তাহার ভক্তিতে সন্দেহ। ভক্তকে কে চেনে, যদি ভক্তের বিশেষ গুণ না জানি। ভক্তের এই দোষ, এই গুণ, এই অন্যায়, এই ন্যায় এরূপ বিচার কি করিবে? কত লোকে ভক্তকে বড় করিতে গিয়া ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হইল। কত লোকে এক ভক্তকে সম্মান করিতে গিয়া অন্য ভক্তদের ছাড়িয়া গেল। মনুষ্য ভক্তনামের বিরুদ্ধে কত কথা বলিতে পারে। মনুষ্যশোণিতে পৃথিবী লোহিত হইল ভক্তের নামে। ভক্ত লইয়া টানাটানি করিও না। যাও ঈশ্বরের কাছে, ভক্তেরা আপনারাই আসিবেন। ভাই বন্ধু! সাবধান হও, আমরা ভক্তকে জানি না, ভক্তকে ভাল বাসিতে পারি না, ঈশ্বর ছাড়িয়া। ঈশ্বরকে ভালবাসা সহজ, ভক্তকে ভালবাসা কঠিন। এক ভক্তকে হয়ত হৃদয়ে লইব, আর এক ভক্তকে হয়ত কম ভাল বাসিব। এক জন যোগী লইতে গিয়া হয়ত ভক্তকে পরিত্যাগ কর, ভক্ত লইতে গিয়া হয়ত যোগীকে পরিত্যাগ কর। যদি প্রাণেশ্বরকে ধর, সেখানে সকলে সমান ব্যবধানে রহিয়াছেন, সকলকেই পাইবে। মা এক স্থানে স্থির হইয়া রহিয়াছেন; ঈশা টানেন এক দিকে, শ্রীগৌরাঙ্গ টানেন এক দিকে, বুদ্ধ টানেন এক দিকে, মুষা টানেন এক দিক। চারিদিকে চারি জনে টানিলে তিনি সমভাবে থাকেন। তিনি কত সাধু লইয়াই রহিয়াছেন। চারি দিকে তাঁহার সাধুগণ। যদি ওদিক দিয়া এস, এক দিকে টানিবে; যদি মধ্যস্থলে এস সকলকেই পাইবে। তুমি কি বলিবে, আমি কেবল খ্রীষ্টকে চাই, গৌরাঙ্গ কে? শ্রীগৌরঙ্গের মুখ দেখিয়া কি হইবে? কেবল কি তুমি খ্রীষ্টকে লইবে? কেবল যদি বল, গৌরঙ্গকেই আমি লইব, খ্রীষ্টকে আমি লইব না, মা বলিবেন, আবার পুরাতন ভ্রম? সন্তানরত্ন কেউ বোঝে না, মা যদি না বোঝান। মা যদি না দেখান, কে কি দেখিতে পায়? আমাদের মত এই, নব বিধানের এই মত যে, মা না বুঝাইলে আমরা কোন ভক্তকে বুঝিতে পারি না। তুমি কি রামমোহন রায় কে বুঝিয়াছ? দেবেন্দ্র ঋষিকে তুমি কি বুঝিতে পারিয়াছ? এই দুই নিকটস্থ স্বদেশীয় সাধুকেই যখন বুঝিলে

না, তখন বিজাতীয় দূরস্থ সাধুদিগকে কিরূপে বুঝিবে ? ঈশ্বর না চিনাইলে কেহ কোন কালে কোন সাধুকেই চিনিতে পারে না। এক জনকে জানিতে গিয়া আর পাঁচ জনের কাছে হয়ত অপরাধী হইতে হয়। ভক্তেরা মার অঞ্চল ধরিয়া রহিয়াছেন। সাবধান মন! কুটিল বুদ্ধি খাটাইও না। কেবল চৈতন্যকে যদি লও, আমি বুঝিব মন বুঝি যোগের বিরোধী, মন শুষ্ক হয় বলিয়াই বোধ হয় বলে, গৌরঙ্গকে লইয়া কি হইবে ? বোধ হয় মন আমার বিবেকের বিরোধী, তাই ঈশাকে লইতে চায় না। একটি লইব, একটি ছাড়িব, তাহা হইবে না। ভক্তের বাজারে মনের মত রঙ্গের পুতুল কিনিব ; দুই পয়সায় যে পুতুল পাওয়া যায়, সেই পুতুলই কিনিব ? বহুসাধনে যাহা প্রাপ্য, তাহা কিনিবার কি প্রয়োজন ? বাজারে গিয়া যে কিনিবে ভক্ত ; সে ভক্তি যদি ভাল লাগে, তাই কিনিবে। সাদা বিবেক কিনিবে না। রাঙা পুতুল কিনিয়াই ফিরিবে। কিন্তু উৎসবের সময় মা সাদা, সবুজ, গোলাপি, হলদে কত পুতুল লইয়া আসিয়াছেন। ভক্তি দিয়া যে মাকে প্রণাম করিয়াছে, মা তাহাকে অমনি কত পুতুলই দিয়াছেন। মা বলিলেন, ইনি বড়, ইহঁাকে প্রণাম কর, ইনি মেজ, ইনি সেজ, ইনি ন— ইহাঁদিগকে প্রণাম কর। ভাল করিয়া সমাদর কর, উৎসবের সময় স্বর্গীয় ভাই ভগ্নী সব আসিয়াছেন। ভক্ত বলিলেন, তাহাই হউক।

হে দয়াসিন্ধু, হে প্রেমের সমুদ্র, কে জানে তোমাকে, কে জানে তোমার ভক্তকে ? খাই দাই বেড়াই, সামান্য ভাবে আছি। এ কঠিন কর্ম্মে যে সাহস হয় না। আমি বাজারে গিয়া পুতুল বাছিয়া কিনিব, এ ভরসা আমার নাই। সাধু লইয়া মহাসংগ্রাম হইয়াছে পৃথিবীতে। কত দেশ পরিপ্লাবিত হইল সাধুর জন্য—মানুষের শোণিতে। ভক্তে ভক্তে সংগ্রাম। এখন এই উনিশ শতাব্দীতে কি করা উচিত ? গরিবের ছেলে আমরা, জ্ঞানহীন, পুরাণ পাঠ করিয়া ছেলে চিনিতে পারিব না। ভক্তের প্রাণধন, ভক্ত আমাদের গলার হার। ভক্তনামের ন্যায় মিষ্ট শব্দ আর কাণে যায় নাই। ভক্ত না থাকিলে খাওয়া হয় না, নিদ্রা হয় না। তোমাকে ভাল বাসিব, আর তোমার ভক্তকে তাড়াইয়া দিব, তোমার সাম্‌নে ভক্তের গলা ছেদন করিব, ইহা আমরা কোন মতেই পারিব না।

বিশেষ উৎসবের সময় তোমার ইচ্ছার সঙ্গে যোগ দিয়া তাঁহাদিগকে বরণ করিব, হৃদয় শীতল হইবে। আগে তোমাকে চাই, তার পর দেবীনন্দনকে চাই। যত ধন স্বর্গে আছে, পুত্রধনের ন্যায় আর কি ধন আছে? ধন আনিবে ত দয়াময়ি সমুদয় ধন লইয়া এস। এক দিকে ঈশা, এক দিকে শ্রীচৈতন্য লইয়া এস। ভক্তধনে ধনী কর; ব্রহ্মধনে ধনী কর; স্বর্গধনে ধনী কর। ভাই বলে সমস্ত সাধুদিকে আলিঙ্গন করিব। বলব, জননীর সঙ্গে এসেছ, বৎসরান্তে আলিঙ্গন দাও। স্বর্গ আলিঙ্গন করিবে পৃথিবীকে, পৃথিবী কৃতার্থ হইবে। ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে? এই সুখ দাও; এই শান্তি দাও, হে সন্তান বৎসল, যেন প্রেম ভক্তি দিয়া তোমাকে পূজা করিতে পারি। সাধু সম্মান করিয়া যেন হৃদয়কে নববৃন্দাবন করি! এই সুখে যেন সুখী হইতে পারি, দয়াময়ি, সন্তানদিগকে আজ এই আশীর্ব্বাদ কর।

অভ্রান্তবাদ।

রবিবার, ১৫ কার্ত্তিক ১৮০৩ শক।

ঈশ্বরকে যাহারা না মানে ব্রহ্মমন্দির তাহাদিগকে নাস্তিক বলিল। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাস্তিক কে, উত্তর দেওয়া চাই। যাহাদিগের শাস্ত্রে অবিশ্বাস আছে, তাহারা নাস্তিক, আমরা এখানেই শুনিয়াছি। এই দুই শ্রেণী ছাড়া আর সকলকে আস্তিক বলিতে পারা যায়। একটু ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায়, শাস্ত্র মানিলাম বটে, কিন্তু শাস্ত্রমানিয়াও উহাকে ভ্রান্ত বলিলাম, উহা সম্পূর্ণ অভ্রান্ত হইল না। ঈশ্বর মানিলাম, শাস্ত্র মানিলাম, তথাপি বিশ্বাসীর রাজ্যে পরিগণিত হইলাম না, কেননা শাস্ত্র অভ্রান্ত বলি নাই বলিয়া সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয় নাই। অভ্রান্ত ঈশ্বর, অভ্রান্ত শাস্ত্র। ঈশ্বর প্রকাশিত শাস্ত্র, ঈশ্বর প্রকাশিত জ্ঞান, ঈশ্বর প্রকাশিত যে বুদ্ধি তাহা অভ্রান্ত, ইহা না মানিলে পূর্ণ বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাসিগণের মধ্যে কখন পরিগণিত হইতে পার না, যদি এই অভ্রান্ত মত গ্রহণ না কর। এমন সম্প্রদায় আছে, এমন লোক আছে, যাহারা ঈশ্বর মানিল, শাস্ত্র মানিল, ব্যক্তি-

বিশেষে মনুষ্যবিশেষে অভ্রান্তি স্বীকার করিল। কি, মানুষ অভ্রান্ত? কি সর্ব্বনাশ!! কি সর্ব্বনাশ!! এই বলিয়া কতকগুলি লোক ধর্ম্মের বিরোধে দণ্ডায়মান হইল। তাঁহারা এ পথ ছাড়িয়া অন্য-পথে চলিলেন। মানুষ ভ্রান্ত এই কথা স্বীকার করিয়া তাঁহারা বিনয়ের মুকুট পরিধান করিয়া গৌরবান্বিত হইলেন। ছি! ছি! মানুষ অভ্রান্ত এ কথা কোন মূর্খে বলে! ইহাতে ঈশ্বরের অপমান, শাস্ত্রের অপমান। মনুষ্য পাপী, কিছুই তাহার স্থির নাই, সর্ব্বদা তাহার বুদ্ধি আন্দোলিত, তরঙ্গে পরিচালিত, পরিমাণে কীট, সেই মানুষ অভ্রান্ত? একটি ক্ষুদ্র রেণুর তুল্য যে নয়, তাহাকে অভ্রান্ত বলিয়া নমস্কার করিব? এ যে ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের অবমাননা, এই বলিয়া পণ্ডিত একদিকে চলিলেন, অভ্রান্তবাদী লজ্জায় অধোবদন হইয়া ক্ষুণ্নহৃদয়ে অপরদিকে চলিলেন। জনসমাজে ভ্রান্তিবাদ স্বীকৃত হইল। ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মত বলিয়া আত্মপরিচয় দিল। ভ্রান্তিবাদ স্বর্গীয় মাননীয় পন্থা বলিয়া সকলে গ্রহণ করিল। যত ভ্রান্তি বলি, তত ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হই। আমি ভ্রান্ত যত বলি, তত অপর সকলে মহৎ বলে। ভ্রান্তিবাদী এবং পৃথিবীর লোক এ দুয়ের মধ্যে পরামর্শ ছিল, সুতরাং পৃথিবীতে পরিষ্কার-রূপে ভ্রান্তিবাদ সমুন্নত বলিয়া বিনয়ের ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইল। অভ্রা-ন্তবাদ হইতে ভ্রান্তিবাদ উৎকৃষ্ট দুইজনে ছাপাইয়া দিয়া প্রচার করিল। যদি আজ আমি ভ্রান্তিবাদ গ্রহণ করি, গৌরবের মুকুট পাইতে পারি। তুমি স্বীকার করিলে তোমার বুদ্ধি ভ্রান্ত, তোমার চরিত্রে আজ যাহা হইতেছে সকলই ভ্রান্ত, কাল কি হইবে কিছুই স্থিরতা নাই, আজ যাহা বিশ্বাস করি-তেছ কাল তাহার বিপরীত বিশ্বাস করিতে পার। অতএব তোমার সমুদায় জীবন ভ্রান্তিপূর্ণ। আমি গুরু বলিয়া তোমাকে কি প্রকারে প্রণাম করিব। তুমি বলিলে পৃথিবীতে এমন সাধু বা মহাত্মা কেহ জন্মেন নাই যাঁহার ভ্রান্তি ছিল না। সুতরাং সরল অন্তঃকরণে ভ্রান্তি প্রকাশ করা ইহাই ধর্ম্ম। এ সরলতা ছাড়িয়া ধর্ম্ম হয় না। যখন এইরূপ বিবাদ উপস্থিত, তখন এই প্রশ্ন উপস্থিত, ভ্রান্তিবাদী অভ্রান্তবাদী ইহার মধ্যে কে ভাল? যে ব্যক্তি অভ্রান্তবাদ স্বীকার করিল সে অহঙ্কারীর মধ্যে গণ্য হইল, আর যে ভ্রান্তবাদ প্রকাশ করিল সে বিনয়ী বলিয়া প্রশংসিত হইল। এখন বল কে ভাল!

ব্রহ্মমন্দিরের বেদী এ বিষয়ে কি বলে শুন। মানুষ যদি আপনাকে ভ্রান্ত-বলে সে লোকের কাছে যাইও না। সে ভয়ানক ব্যাঘ্র, তোমাকে দংশন করিবে, মারিয়া ফেলিবে, সে তোমাকে গ্রাস করিবার জন্য মুখ ব্যাদান করিয়া আছে, সাবধান হও। ভ্রান্তিবাদী যদি উপদেশ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হন, ভয়ে ভীত হইয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিবে। যে এত দূর আপনাকে ভ্রান্ত বলিয়া মনে করে, সর্ব্বদা আপনাকে ভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করে, কোন মত তাহার ঠিক নহে, সকল মতই ভ্রান্ত, একথা বলে, তখন জানিও সে বলে না কিন্তু ঈশ্বর তাহার মুখ দিয়া সেই কথা বলান, ঈশ্বর সকলকে সাবধান করেন যে তাহার নিকটে না যাওয়া হয়। ভ্রান্তিবাদের নিগূঢ় অর্থ এই, আমরা মনুষ্য, আমরাই সকল করি, ঈশ্বর আমাদিগের ভিতর দিয়া কিছু বলেন বা করেন ইহা আমরা বিশ্বাস করি না, আমরা তাঁহার কোন কথা শ্রবণ করি না। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদিগের কোন সম্বন্ধ নাই। ভ্রান্তিবাদী যখন এ কথা বলিতেছে, তখন তিলার্দ্ধ আর তাহার সম্মুখে বিলম্ব করিও না। এই কথা যখন তাহার মুখ দিয়া ঈশ্বর বলাই-তেছেন তখন আমাদের কর্ত্তব্য কি তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না। আমরা যত শীঘ্র পারি পলায়ন করিয়া, এ বিপদের পথ হইতে আপনাদিগকে উদ্ধার করিব। এই কুমতের উচ্ছেদ জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দেওয়া উচিত। যাহারা এই মত প্রচার করে অথচ উপদেষ্টা হয়, এক অন্ধ যেমন অন্য অন্ধকে পথ প্রদর্শন করে, তাহারা তদ্রূপ। তাহাদের সংসর্গ চিরপরিহার্য্য।

ইহার বিপরীত কথা ঠিক। এই যে ভ্রান্তিবাদ ইহাই সংশয়বাদ, অবিশ্বাস, নাস্তিকতা। ইহার বিপরীত অভ্রান্তিবাদ। মানুষ অভ্রান্ত হইতে পারে। মানুষ অভ্রান্ত হইয়াছে, অভ্রান্ত হইবে। চিরকাল অভ্রান্ত আছে, অভ্রান্ত হইবে, এই নূতন বিধি পাঁচটির একটি। ভ্রান্তবাদে যদি বিশ্বাস কর তবে মরিলে, নববিধানের মস্তকে কুঠারাঘাত করিলে, উন্নতির পথে কণ্টক রোপণ করিলে। ভ্রান্ত গুরুকে গুরু বলিয়া কি প্রকারে গ্রহণ করিতে পারা যায়। যে লোক ঈশ্বরকে সত্য বলিয়া স্বীকার করে না, সাব-ধান যেন তাহার সঙ্গে সম্বন্ধ না হয়। যে লোকের ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই, তাহার সকল সময়ে মত পরিবর্ত্তন হইবে। এ ব্যক্তি হয়তো প্রথমে দুই ঘণ্টা

ঈশ্বরের পূজা করিবে, অল্পে অল্পে তদ্বিষয়ে তাহার মত পরিবর্ত্তন হইয়া আসিবে। যাই পবিত্র হিমালয়ের উপরে যোগমন্দিরে প্রবেশ করিবে, যেখানে সর্ব্বদা নির্ম্মল বায়ু বহিতেছে, চতুর্দ্দিক জনশূন্য, অমনি বলিয়া উঠিবে ভ্রান্তবাদী চলিয়া যাও। নব বিধান বলিতেছেন ঈশ্বর এবং তাঁহার শাস্ত্র মানিতে হইবে, ঈশ্বর যেমন অভ্রান্ত তাঁহার শাস্ত্রও তেমনি অভ্রান্ত বিশ্বাস করিতে হইবে। অভ্রান্ত শাস্ত্রের কথা যখন বলা হইতেছে তখন ইহাও বলা হইতেছে যে ভ্রম আছে। কোথায় ভ্রম আছে? পুস্তকে ভ্রম আছে, মানুষের মনে ভ্রম আছে। যদি ভ্রম আছে তবে অভ্রান্তবাদ কি প্রকারে হইল? অভ্রান্তবাদ আছে। মানুষ ভ্রান্ত একথা বলিয়া আসিয়াছি, মানুষ অভ্রান্ত এ কথাও বলিয়াছি। কোন বিষয়ে কি মানুষ অভ্রান্ত নয়? বল, তুমি কোন বিষয়ে অভ্রান্ত নও। আলোচনা কর, আলোচনা করিয়া বল, তোমার অভ্রান্তি নাই, কোন বিষয়ে নাই। অভ্রান্ত বলিলে পূর্ণঈশ্বরের অধিকার আরোপ করা হয় না; অভ্রান্তি বলিলে অনন্ত অভ্রান্তি বুঝায় না। তুমি প্রেমিকও বট, অপ্রেমিকও বট, ভক্তও বট অভক্তও বট। তোমার জীবনে মিথ্যা আছে, দুচারিটি সত্যও আছে। সুতরাং তোমাতে ভ্রান্তিও বিদ্যমান, অভ্রান্তিও বিদ্যমান বলিব। অনন্ত অভ্রান্তি কেবল ঈশ্বরেতে; মনুষ্যে উহা কখন সম্ভব নহে। মনুষ্যেতেতো অনন্ত শক্তি নাই, অনন্তজ্ঞান নাই, অনন্ত প্রেম নাই। সেই জন্য বলিতেছি মানুষ ভ্রান্তও আছে, মানুষ অভ্রান্তও আছে। কিছুই যদি অভ্রান্ত নয়, সকলই ভ্রান্তি, তবে ভারতে ধর্ম্মের জয় সত্যের জয় হইবে কি প্রকারে বলিতে পার। সমুদায় ভ্রান্তি, বলিলে ব্রহ্মমন্দিরে আইসা বন্ধ করিতে হয়। আমার এ উপদেশ ভ্রান্তি, ঈশ্বরতত্ত্ব ভ্রান্তি, আমরা তাঁহার আদেশ পাই তাহা ভ্রান্তি, পরলোক ভ্রান্তি। যোগ করিলে ভক্তিসাধন করিলে তাহার নীচে ভ্রান্তি রহিল, এক এক ব্রহ্মমন্দির স্থাপিত হইল, তাহার নীচে কত ভ্রান্তি গুপ্তভাবে রহিল। এ যদি বল ধর্ম্মের মূল শিথিল হইল, ঈশ্বরবিশ্বাস বিনষ্ট হইল। কোন দস্যু কোন নাস্তিক যে ঈশ্বর মানে না সেই এই ঘোর অবিশ্বাস আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। নাস্তিক অবিশ্বাসী দস্যু যত দূর দৃষ্টি করে কেবলই ভ্রান্তি

দেখে। এদিকে ওদিকে কেবলই ভ্রান্তি। আমার মত, বুদ্ধি, রুচি, ভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু এই স্থানে এই প্রাচীরের মধ্যে ব্রহ্ম আছেন, জ্ঞানময় হইয়া বিরাজ করিতেছেন, আমি ইহার জন্য মরিলেও সত্য বলিব। ঈশ্বর যদি প্রবঞ্চক হইলেন, ভ্রান্তি যদি সমুদায় বস্তু হইল, তবে আর তুমি আমি কোথায় রহিলাম? রবিবারে রবিবারে এখানে আসিয়া প্রয়োজন কি? যদি সমুদায় ভ্রান্তি হইল তবে ভ্রান্তি সাধন করিয়া কি হইবে? উপাসনা, ধ্যান, আরাধনা সমুদায়ই ভুল। এ সমুদায় ভ্রান্তি প্রচার করিবার জন্য প্রচারব্রত অবলম্বন কেন করিব? ব্রহ্ম আছেন ইহা যদি ভ্রান্তি হইল, অব্রাহ্ম কেন হইব না, ভ্রান্তির পথে কেন ঘুরিয়া মরিব? ঈশ্বরের দয়া অনন্ত ইহাও ভুল, সুতরাং উপাসনাও ভুল, সাধনও ভুল। এ সব কাপুরুষের কথা কিছুতেই শুনিতে পারি না। যদি ভ্রান্তিবাদ থাকে ব্রাহ্মধর্ম্মে থাকুক, নববিধানে নিশ্চয় ভ্রান্তিবাদ থাকিতে পারে না। তুমি আছ, আমাদের সম্মুখে এই উপাসকমণ্ডলী আছে, আমাদিগের মধ্যে ঈশ্বর আছেন, ইহা নিশ্চয় বিশ্বাস করিব। তুমি আছ, আমি আছি, এই সমুদায় লোক আছে, অনন্তশক্তি ঈশ্বর আছেন, ইহাতে ভ্রান্তি হইতে পারে না। যে আলোক দেখিতেছি, অভ্রান্ত বুদ্ধিতে বলিতে পারি না, আলোক নাই। এ সকল বিষয়ে পূর্ণ অভ্রান্তি, অন্যত্র ভ্রান্তির সম্ভাবনা। আমি আছি, ঈশ্বর আছেন, পরলোক আছে, এ সম্বন্ধে জ্ঞানকে কখন ভ্রান্ত বলিব না। সকল বিষয়ে অভ্রান্তি পরিমাণে, অনন্ত সম্বন্ধে নহে। আমা অপেক্ষা তুমি, তোমা অপেক্ষা অপরে সমধিক অভ্রান্ত হইতে পারে, কেন না অল্পাধিক সাধন দ্বারা এক জন আর এক জন অপেক্ষা অভ্রান্ত হইয়া থাকে। আমার অভ্রান্ততার ভূমির পরিমাণ অর্দ্ধ হস্ত, তোমার এক হস্ত, অপরের হয় তো পাঁচ হস্ত, আর এক জনের হইতে পারে ১ ক্রোশ, এইরূপ অভ্রান্ততার ভূমির পরিমাণের তারতম্য হইয়া থাকে। মনুষ্যে মনুষ্যে এ সম্বন্ধে ইতর বিশেষ আছে, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিতে কিছু না কিছু অভ্রান্তি আছে। আমি আমার অভ্রান্ত জ্ঞানে স্থিরবিশ্বাসী, তৎসম্বন্ধে আমার কখন ভ্রান্তি হয় না। এই জ্ঞান উজ্জ্বল এবং স্পষ্ট, ইহাতে কখন ভ্রম আসিতে পারে না। সত্যবাদী হও, ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, ইহাতে কি তোমার জ্ঞান অভ্রান্ত নহে? তুমি আপনাকে

বিনয়ী দেখাইবার জন্য আপনাকে ভ্রান্ত বলিলে, ইহাতে সামান্য অপরাধ হইল না। তুমি ইহার দ্বারা ঈশ্বরকে বঞ্চক বলিলে। এ যে কপট ধূর্ত্তের বিনয়। এ যে পৃথিবীর অবিশ্বাস নাস্তিকতা। আজ যাহা ঈশ্বরের বাণী বলিয়া বিশ্বাস করিলে, ধর্ম্ম বলিয়া সাধন করিলে, কয় দিন পরে সংসারের সামান্য বস্তুর ন্যায় তাহাকে ভ্রান্তি বলিয়া পরিত্যাগ করিলে, আজ বলিলে এক কথা, কাল প্রাতে তাহার বিপরীত বলিলে, ইহা কখন মনুষ্যোচিত নহে, বিশ্বাসোচিত নহে। যে ভ্রান্ত সে অবিশ্বাসী নাস্তিক। তোমার বিনয় ঈশ্বরকে প্রবঞ্চক করিয়া লোকের মন ভুলাইতে প্রবৃত্ত। ঈশ্বর আজ তোমার জন্য মিথ্যাবাদী হইলেন। ঈশ্বরকে মিথ্যাবাদী করিয়া পাঁচ জনের মুখে তোমার বিনয়ের প্রশংসা শুনিতে অভিলাষ। দেখিও এরূপ যেন কখন তোমার আমার অবস্থা না হয়। মুষা ঈশ্বরের মুখে যে যে আজ্ঞা শুনিলেন, তিনি তাহা কাগজে লিখিলেন না, কেন না তাহা ছিঁড়িয়া যাইবে। পাথরের উপর সেই সকল লিখিত হইল। অতএব তুমি ঈশ্বরের মুখে যাহা কিছু শুনিবে প্রস্তরে খোদিত করিয়া তাহা রক্ষা কর। সেই সকল আপনি দেখ এবং দেখাও, ব্যাখ্যান করিতে সেই সকলের ব্যাখ্যান কর। ঈশ্বর "আমি আছি' মুষার ন্যায় প্রত্যেককে বলিতেছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, ঈশ্বর, তোমার নাম কি, তিনি বলিবেন "আমি আছি, সকলকে গিয়া বল, "আমি আছি, আমায় প্রেরণ করিয়াছেন।" এ কথা শুনিয়া কি আর বলিতে পার ঈশ্বর আমায় কিছুই বলেন নাই? তুমি কার্য্যালয়ে বেতন গ্রহণ করিলে, তখন কি তোমায় কেহ বলিয়াছে, তুমি সংসারী হও, সুখপ্রিয় হও? তুমি টাকা লইয়া অনুচিত বড় মানুষী কর? ঈশ্বর কি তোমায় ধমক দিয়া লোভ সংবরণ করিতে বলেন নাই? এই যে তোমায় লোভ সংবরণ করিতে বলিলেন, এই তো দুটি অভ্রান্ত শাস্ত্র লাভ করিলে। এইরূপ গণনা করিয়া যাও, তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম নবম দশম একাদশ দ্বাদশ শত সহস্র অভ্রান্ত আদেশ দেখিতে পাইবে। সৎ পথে যাইবার জন্য যে ঈশ্বরের আদেশ পাইয়াছ তাহা যথার্থ বলিয়া জান। যে যে ঈশ্বরের উপদেশ সত্য তাহা প্রকাশ করিতে কেন ভয় করিবে? সমুদায় আদেশ উপদেশ সুচারুরূপে প্রস্তরে লিখিয়া রাখ। উহার পার্শ্বে অভ্রান্ত

বেদ, অভ্রান্ত ঈশ্বরের বাক্য, অভ্রান্ত ব্রহ্মবাণী, অভ্রান্ত দৈববাণী, এই শব্দ অঙ্কিত কর। সমুদায় আদেশ উপদেশ অক্ষরে সংযুক্ত হইলে উহা বেদ হইল। আমাদের হরির সমুদায় বিধি অভ্রান্ত। অভ্রান্ত জ্ঞান অভ্রান্ত বুদ্ধি অভ্রান্ত বিদ্যা সমুদায় তাঁহার নিকট হইতে আইসে, তাঁহার অভ্রান্ত বিধির একটিও বর্ণান্তর হয় না। তিনি যাহা আদেশ করেন উপদেশ দেন, তাহা কিছুতেই নড়িবে না। সকলের মধ্যেই এই অভ্রান্ত বেদ আছে, কেবল এই চাই যে তাহার ভূমি বিস্তীর্ণ হউক। আজ দশটি, কাল ১২টি অভ্রান্ত সত্য লাভ করিলে, যাহাতে ২০ টি অভ্রান্ত সত্য লাভ করিতে পার তাহার জন্য যত্ন কর। ক্রমে এমন সৌভাগ্য হউক যে এক শতটি অভ্রান্ত সত্য সংগ্রহ করিতে পার। যিনি এইরূপ অভ্রান্ত সত্য লাভ করিতে পারিবেন, তিনি ধন্য হইবেন। আজ যে পরিমাণে অভ্রান্ত আছ, কল্য তদপেক্ষা আরও অভ্রান্ত হইবে। আজ এক জন একটি অভ্রান্ত সত্য পাইল। ক্রমে এক জন পঞ্চাশটির মধ্যে চল্লিশটি অভ্রান্ত সত্য লাভ করিবে। পৃথিবীর এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত এইরূপে অভ্রান্তবাদের রাজ্য বিস্তৃত হইবে। ক্রমে প্রেমেতে পুণ্যেতে অভ্রান্তি উপস্থিত হইয়া উন্নতির পর উন্নতি হইতে থাকিবে। ক্রমে সকল বিষয়েই এইরূপ উন্নতি হইবে, সুখ হইবে। এই নববিধানে আমি কেবলই সুখ সম্ভোগ করিব। ঈশ্বর সহ বিয়োগের ভূমিতে আমি ভ্রান্ত, পূর্ণ অভ্রান্তি আমার নাই। কিন্তু আমি যত যোগী হইব, তত অভ্রান্ত হইতে থাকিব। যোগের সময়ে আমার এ জিহ্বা আমার নয়, আমার হস্ত আমার নয়, এই কলম যাহা দিয়া আমি লিখিতেছি, তাহাও আমার নয়, ঈশ্বরের এই রসনার বাক্যে, এই লিখিত প্রবন্ধে সমস্ত পৃথিবী কাঁপাইব। হিমালয় টলমল করিবে, সমুদ্রে মহা তুফান উঠিবে। মানুষ নয়, মহাদেব জীবের ভিতরে থাকিয়া হিমালয়কে টলান, সমুদ্রে মহা তুফান উত্থিত করেন। আমরা নীচ আমরা ক্ষুদ্র, আমাদের ভাবও অতি নীচ এবং ক্ষুদ্র। কিন্তু মহাদেবের সঙ্গে যোগ হইলে ক্রমে ক্রমে সমুদায় অভ্রান্ত হইয়া উঠে। কাহাকেও বলিতে দিব না তোমাদের সকল মত ভ্রান্ত। ভ্রান্তবাদকে বিনাশ করিতে প্রস্তুত। শাণিত খড়্গ হস্তে ধারণ করিয়া ভ্রান্তবাদের মত খণ্ড খণ্ড করিব। দৃঢ়তার সহিত নির্দ্ধারণ

করিব, ঈশ্বরের ভক্ত সন্তানগণ নিশ্চয় অভ্রান্ত। সেই সকল লোকের মধ্যে প্রবল নরপতি থাকেন তাহাতে কি? বড় বড় যোদ্ধা বড় বড় মানুষ সত্যের পরাক্রমে সকলকে পরাজয় করিবে, অভ্রান্ত মত স্থাপন করিবে। যাহা যাহা ঈশ্বরের নিকটে শুনিয়াছি, বলিব ইহা নিশ্চয় সত্য। আমাদিগের শাস্ত্র এতগুলি নিশ্চয় করিয়া বল। মনুষ্য মূর্খ, তাহাদের বুদ্ধি কিছুই নাই। ব্রহ্মসাধক, তুমি কি সত্য সকল ঈশ্বর হইতে পাইয়াছ, ইহার উত্তর হাঁ পাইয়াছি। ব্রহ্মের আদেশকে ভূমি করিয়া তদুপরি দণ্ডায়মান হও। সত্য উপলব্ধি কর। "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং, ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং" বলিতে বলিতে ঈশ্বরের কৃপার উপরে বিশ্বাস করিয়া পৃথিবীকে টলাইবে, ক্রমান্বয়ে সেই মহাবাক্য উচ্চারণ করিতে থাকিবে।

ব্রহ্মোপাসনা।

রবিবার, ৬ অগ্রহায়ণ ১৮ ৩ শক।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন কেন, অনেকে মনে করিয়া থাকেন, ব্রহ্ম মন্দিরের বেদী হইতে দুর্ব্বোধ সত্য সকল বিবৃত হয়। যাহা সাধারণ সাধক-মণ্ডলীর বোধাতীত, যাহা অল্পসংখ্যক সাধকশ্রেণীর উপযোগী তাহাই এখান হইতে বলা হয়, যাহা বলা হয় তদপেক্ষা আরো সহজ সত্য সহজে বিবৃত করিলে সকলের বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা। যদি এ যুক্তি অবলম্বনীয় হয়, তবে আজ উপাসনাসম্বন্ধে সহজ কথা বলি শুন। কিরূপে উপাসনা করিবে, কিরূপে ডাকিবে, কিরূপে ডাকিলে কি ফল লাভ করিবে, ইহা সকলেরই জানা কর্ত্তব্য। ডাকিবার প্রণালী কি? আজ শক্ত কথা কঠিন তত্ত্ব দূরে রাখিয়া সহজ ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী নির্দ্ধারণ করা যাউক। উপাসনার সর্ব্ব-প্রথমে বসিবার আসন। উপাসনা করিতে গেলে আসন গ্রহণ করিতে হইবে। এমন আসন গ্রহণ করিবে যাহাতে উপাসনার ব্যাঘাত না হয়, মনকে উন্নত করিবার পক্ষে উহা অনুকূল হয়। উপবেশন যদি ভাল না হয়, উচ্চ সাধনে সক্ষম হইবে না, বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে

আসন ঠিক করা উচিত। আসনে উপবেশন নিয়মানুসারে করিতে হইবে। মন সুস্থ, শরীর স্থির, হস্তপদাদি যথাস্থানে স্থিত, এইরূপ ভাবে আসনে উপবেশন করিবে। আসন তখনই যথার্থ হয়, যখন শরীর মন আসনে প্রকৃতিস্থ থাকে। যদি শরীর মন চঞ্চল হয়, উপাসনা হয় না। সুতরাং আসনের নিয়ম সর্ব্ব প্রথমে অত্যন্ত প্রয়োজন। যখন আসনে উপবেশন করিলে, তখন তোমার মুখ চক্ষু হস্ত বক্ষ ঈশ্বরের সম্মুখীন হইল, সমস্ত অঙ্গ উপাসনার অভিমুখীন হইল, অনুকূল অবস্থায় নীত হইল। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, কিন্তু মনুষ্য উপাসনা কালে তাঁহাকে সম্মুখে উপলব্ধি করিবে। তিনি চারি দিকে আছেন, অথচ উপাসনা কালে সাধক সমক্ষে তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিবেন। ঈশ্বরের সম্মুখীন হইয়া স্থির ভাবে পরিষ্কৃত আসনে পরিমার্জ্জিত স্থানে উপবেশন করিলে, বিঘ্ন নাই কোন অকল্যাণের সম্ভাবনা নাই, এখন মনকে ঈশ্বরের অভিমুখে স্থির রাখিবার জন্য উদ্বোধন করিবে। উদ্বোধন ও ঈশ্বরকেবোধের বস্তু করিবার জন্য যত্ন একই। বোধন উদ্বোধন নিতান্ত আবশ্যক। মন্দিরের দ্বার খুলিল, উপবেশন করিলে, এখন উপাসনার উপক্রমণিকা, আরম্ভ ও ভূমিকা উদ্বোধন। উদ্বোধনান্তে আরাধনা। এই আরাধনা ব্রহ্মপূজার জীবনস্বরূপ। উপাসনা করিতে গেলে কতকগুলি উদ্বোধক শব্দের প্রয়োজন। উপাসনার প্রধানোপায় কি? শব্দ। শব্দ কি? যে শব্দে ধর্ম্মের দুরূহ ব্যাপার সিদ্ধ হয়। মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হয়, ঈশ্বরজ্ঞান ঈশ্বরভাব উত্তেজিত হয়। শব্দ চিন্তার জন্য একান্ত আবশ্যক। চিন্তা মনে মনে কর, তথাপি তোমাকে শব্দ ব্যাবহার করির্তে হইবে। শব্দ অতীন্দ্রিয় ব্যাপার! শব্দ পরিত্যাগ করিলে কিছুই হয় না। "সত্যম্" এইটি সাধনের প্রথম মন্ত্র। "সত্যম্" এই শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে ঈশ্বরের ভাব উদ্বুদ্ধ হয়। যিনি উপাসনা করিবেন, তিনি নির্জ্জনে উপাসনা করুন বা আচার্য্যের সঙ্গে মিলিত হইয়া শত শত ব্যক্তির সঙ্গে উপাসনা করুন, সকল ব্যক্তিকেই দুই পাঁচটি শব্দ মনে মনে চিন্তা করিতে হইবে, শব্দ সহকারে চিন্তার উদ্বোধন করিতে হইবে। "সত্যম্" বলিতে বলিতে ভাবিবে, এই ঈশ্বর আমার সম্মুখে আছেন। যত ক্ষণ এইটি স্থির না হয়, তত ক্ষণ উপাসনা

হয় না। এইটি হইলে পূজা অর্চ্চনা কি তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। এই হরি, এই আমি পূজা করি। তোমার ঈশ্বরকে তোমার সম্মুখে আনয়ন জন্য উদ্বোধনের প্রয়োজন, ব্রহ্মপূজা ইহা বিনা হয় না। তুমি সংসারে ছিলে, সংসারে আছ, তোমার সম্মুখে এমন পুতুল নাই, যে তুমি তাহাকে দেখিয়া পৌত্তলিকদিগের ন্যায় বাহ্য সামগ্রীতে পূজা করিবে। কোন পুতুল নাই, কোন বাহ্য পূজার উপকরণ নাই, জড়ের সঙ্গে একেবারে সম্বন্ধ বর্জ্জিত, অথচ সে সকল অবলম্বনশূন্য হইয়া ঠিক্ তোমাকে যেন সে সকল আছে এই ভাবে পূজা করিতে হইবে। শূন্যের ভিতর হইতে তোমাকে নিরাকার ঈশ্বর উদ্ভাবন করিয়া লইতে হইবে, বিশ্বাসবলে ঈশ্বরকে আপনার আয়ত্ত করিবে, সকল প্রকারের অবলম্বন ছাড়িয়া সংসারের বিষয়সমূহের অতীত হরিকে সন্নিধানে দেখিয়া পূজা করিবে। হরি সর্ব্বত্র সকল স্থানে আছেন এই যে সর্ব্বব্যাপী ভাব, এই ভাবকে সর্ব্বদা মনে রক্ষা করিয়া বিশেষ ব্রত বিশেষ সাধন বিশেষ আলোচনা আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিবে। পৃথিবীতে আসন পাতিয়া বসিলে এই জন্য যে, যেমন "সত্যং" এই শব্দ মুখ হইতে বাহির হইবে, অমনি তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া পূজা আরম্ভ করিবে। যাই তাঁহাকে সম্মুখে দেখিতে পাইলে অমনি আর একটি মন্ত্র আসিয়া উপস্থিত। ব্রহ্মপূজার দুই মন্ত্র প্রথম "সত্যং" দ্বিতীয় "জ্ঞানম্।" "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" এই যে মহাবাক্য ইহা সমুদায় মহাবাক্যের সার, সমুদায় শাস্ত্রের সার। এই মহাবাক্য সহকারে স্বরূপ চিন্তা করিতে হইবে। এক একটি স্বরূপ এক একটি কথাতে আছে। একটি শব্দ ব্রহ্মের একটি লক্ষণব্যঞ্জক। এক একটি শব্দে একটি লক্ষণ ধরিয়া ব্রহ্ম সাধকের নিকটে পরিচিত হন। জীবমুখবিনির্গত এক একটী কথা এক একটি মহাবাক্য ব্রহ্মের এক এক স্বরূপ এক এক অঙ্গ সাধকের নিকটে প্রকাশিত করে। "সত্যং" এই বাক্য জীবমুখ হইতে নির্গত হইয়া ব্রহ্মের সত্যস্বরূপে প্রবিষ্ট হইল। ঈশ্বর এই বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া বলিলেন "আমি আছি।" তিনি অসৎ নন সৎ, কথা বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া সাধক জানিতে পারিলেন। এই কথা ভিতরে হৃদয়ের মধ্য হইতে ব্রহ্মের বুকের ভিতর গিয়া তাঁহার সৎস্বরূপকে অধিকার করিল।

যেমন "সত্যম্" তেমনি "জ্ঞানম্" ব্রহ্ম জড় নন, জ্ঞান। ঈশ্বর নাই তাহা নহে, ঈশ্বর আছেন, সত্যস্বরূপে আছেন যাই নির্দ্ধারণ হইল, অমনি নির্দ্ধারণ হইল তিনি জড়ের ন্যায় আছেন তাহা নহে, তিনি চিৎ। মুখ বলিল "জ্ঞানম্" আর জ্ঞানশব্দের বাণ ঈশ্বরের জ্ঞানরূপকে বিদ্ধ করিল, ভিতরে দেখি কেবলই জ্ঞান। সত্যমের সত্যে সমুদয় সত্যবান্, জ্ঞানমের জ্ঞানে চারিদিক্ জ্ঞানময় হইয়া উঠিল। সত্যকে দেখিলাম জ্ঞানকে দেখিলাম, সত্যের তরঙ্গে জ্ঞানের তরঙ্গে ভাসিলাম, কিন্তু এখনও কূল দেখা গেল না। অনন্ত-বাণ নিক্ষেপ করিলাম, "অনন্তম্" উচ্চারণ করিতে করিতে সমুদায় কূল কেনারা অন্তর্হিত হইল। পূর্ব্বে গঙ্গায় জল ছিল, সমুদ্রের দিকে গমন করিতে করিতে গঙ্গা ক্রমে বড় হইতে হইতে সাগরের সঙ্গে মিলিত হইল, তার পর ক্রমে দূরে যাইতে যাইতে অকূল সাগরের সঙ্গে মিশিয়া গেল। সত্য ও জ্ঞ ন তেমনি অনন্ত সত্য অনন্ত জ্ঞান হইয়া আমাদের জ্ঞানের অতীত হইল। কে সেই সত্যকে আর জানিবে, কে সেই জ্ঞানের অন্ত পাইবে, উহার সীমা নাই, উহার অন্ত নাই। ভাবিতে ভাবিতে বেদ বেদান্ত অপরাপর শাস্ত্র সকলে পরাজিত হইল। আমি ও তিনি এই মাত্র বুঝা গেল আর কিছু বুঝা গেল না। উপনিষৎ ভাবিতে ভাবিতে অদ্বৈতবাদে গিয়া দাঁড়াইল। সাধক ভীত হইয়া আত্মার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, উপনিষৎ অতিক্রম করিয়া প্রেম ভক্তির শাস্ত্র বাহির হইল! হরিলীলা সাধকের নয়নগোচর হইল। এই লীলার কথা বলিতে বলিতে সাধকের চৈতন্য হইল, তখন তিনি প্রেমের বাণ নিঃক্ষেপ করিলেন। মঙ্গলময়ের সাক্ষাৎকার হইল। মঙ্গলময় ভাবিতে ভাবিতে মঙ্গলময় শব্দ হইতে নিত্য লীলা সকল বাহির হইতে লাগিল, পিতা মাতা গুরু সখা প্রভৃতি নানারূপে নানা ভাবে প্রেমময় হরি নয়নগোচর হইতে লাগিলেন, হরির প্রেমময় লীলা ভক্ত সন্দর্শন করিয়া সুখী হইলেন। জ্ঞান ও অনন্তের অন্তে ভক্তি ও প্রেম লাভ হইল। প্রেম মন্ত্র মঙ্গল মন্ত্র। আত্মা প্রেমের ভিতরে হরিরূপ দর্শন করিয়া মোহিত হইতে লাগিল। চিত্ত হরি লীলাতে মগ্ন হইয়া হরিকে হৃদয়ের পুতুল করিল। অনন্তের আরাধনাতে পৌত্তলিকতার ভয় নাই; প্রেমে সেই ভয় উপস্থিত। এখানে পুতুল নির্ম্মিত

হইবার আশঙ্কা, কে যেন এই কথা বলিল, ভক্তির পথে অনেক দেব দেবী আসিয়াছে, লীলা ভাবিতে ভাবিতে অনেকে অনেক দেব কল্পনা করিয়াছে। যাই এই ভাব মনে আসিল, অমনি "অদ্বৈত" "অদ্বৈত" এই গম্ভীর শব্দ সাধকের মুখে উচ্চারিত হইতে লাগিল, পৌত্তলিকতার দ্বার বন্ধ হইয়া গেল। যিনি ব্রহ্ম তিনি এক মাত্র, যিনি লীলারসময় তিনি এক অদ্বৈত। অনন্তের [illegible] অদ্বৈত আসিলে অদ্বৈতবাদ হইত। তাই প্রেমের ভিতর দিয়া ঠিক সময়ে অদ্বৈত স্বরূপ আসিয়া সমুপস্থিত। এক দিকে প্রহরী হইলেন হরি, আর এক দিকে প্রহরী হইলেন অনন্ত। পৌত্তলিকতা আসিতে পারিল না, অদ্বৈতবাদ উপস্থিত হইল না, হরির একত্ব প্রকাশ পাইল। অনন্তের ভিতর দিয়া মঙ্গলস্বরূপ ভাবিতে ভাবিতে অদ্বিতীয় আসিল। যখন অদ্বিতীয়ের উপাসনা করি, তখন অদ্বৈতের সঙ্গে অন্যান্য গুণ পরিষ্কার হইল, ঈশ্বর উচ্চ হইতে উচ্চ হইলেন। যে ভাবটি পৃথিবীর বহির্ভূত পৃথিবীর অতীত, সমুদায় গুণ গুলি তাহার সঙ্গে মিলিত হইল, দেবভাব নিষ্কলঙ্কস্বরূপ ধারণ করিল। আমি যে অধম ইহা বুঝি. নিষ্কলঙ্ক পবিত্রস্বরূপ নিষ্কলঙ্ক না হইয়া কি প্রকারে বুঝিব? আমি "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্" এই কথা সাধনের ধনুতে যোজনা করিয়া বাণ নিঃক্ষেপ করিলাম, বাণ পৃথিবী হইতে এত দূর উর্দ্ধে উঠিল যে পুণ্যস্বরূপে গিয়া প্রবিষ্ট হইল। বৈকুণ্ঠের বস্তু শব্দযোগে মনুষ্যের হৃদয় স্পর্শ করিল, পৃথিবীর মনুষ্য এই শব্দের সোপান দিয়া স্বর্গে আরোহণ করিল। দক্ষিণে বামে উর্দ্ধে অধোতে দেখ কেবলই পুণ্য, কেবলই পবিত্রতা, কেবলই ধর্ম্ম। এমন অবস্থায় আনন্দবাণ শেষ বাণ নিঃক্ষিপ্ত হইল। যখন ঠিক পুণ্যের ভিতরে সত্য জ্ঞান অনন্ত, প্রেম একত্র মিশিল, সমুদয় এক স্বর্গীয় বর্ণে বিলীন হইল, তখন আনন্দের উদয় হইল। আর বিলম্ব না করিয়য়া সাধক আনন্দ আনন্দ বলিয়া চীৎকার করিল, মনে মনে সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইল, গভীর আনন্দের জল সাধককে নিমগ্ন করিল। ভিতরে উপরে নীচে গভীর আনন্দ জল বাড়িতে লাগিল, আর তাহার ভিতরে ডুবিয়া গেল। যখন ভিতরে আনন্দ বাড়িতে লাগিল তখন আরাধনা শেষ হইল। এখন একাকী নিমগ্ন হইবার সময় উপস্থিত। এখন আরাধনার রাজ্য হইতে ধ্যানের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। যেমন

কোন একটা বাড়ীর এক এক অংশ দর্শন করিয়া পরে সমগ্র বাড়ী দেখা হয়, যেমন কোন একটি লোকের একটি একটি গুণ নিরীক্ষণ করিয়া পরে সমষ্টিতে তাহাকে দর্শন করা হয়, যেমন কোন একটি বৃক্ষের শাখা পল্লবাদি দেখিয়া পরে সমগ্র গাছটি প্রত্যক্ষ করা হয়, চিকিৎসায় একটি একটি ঔষধ ক্রমে সেবন করিয়া পরে মূলরোগের ঔষধ বাহির হয়, তেমনি আরাধনায় এক একটি স্বরূপ বিদ্ধ করিয়া তার পর ধ্যানের সময়। এ সময়ে বেদী হইতে মনঃসংযম করিবার জন্য অনুরোধ আইসে। ধ্যানের সময় উপস্থিত, ধ্যানের শঙ্খ ধ্বনিত হইল। তখন ভিন্ন ভিন্ন ছিল, এখন মিলন। এখন সমুদায় স্বরূপ গুলিকে এক করিতে হইবে। আরাধনার সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপের এক একটি করিয়া বিদ্ধ করা হইয়াছে, এখন আর তাহা চলিল না। ধ্যান কি? এখন আর হাত পা চক্ষু কর্ণ এরূপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আমি দেখিব না; অর্থাৎ এক মার রূপ একটি ব্যক্তিরূপে হৃদয়ের ভিতরে অবলোকন করিব। একটি মন্ত্রে ঈশ্বরধারণ ধ্যান। ধ্যান একত্র সমুদয় গুণের সমষ্টি। একটি মাত্র আধার, যাহাতে চক্ষু মুখ সকলই আছে। মা কি, ধ্যান তাহা বলে না, কেবল বলে মা। মার কি কি গুণ আরাধনায় বর্ণনা করিব, ধ্যানে কেবল মাকে দেখিব। মার কোন কোন্ গুণ ভাবিব, অর্চ্চনা করিব, আরাধনায় তাহা ঠিক করিব। মার কাছে বসিয়া মা মা মা ভাবিতে ভাবিতে কেমন আনন্দ সাগরে ডুবিয়া যাই, ধ্যান আমাদিগকে ইহা বলে। আরাধনায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বরূপ চিন্তন, ধ্যানে একত্র দর্শন। আরাধনার পাত্র তিনি; যিনি এক, যিনি অমৃত যিনি প্রেম, যিনি পুণ্য, যিনি জ্ঞান, যিনি সত্য, যিনি অনন্ত, যিনি আনন্দ। ধ্যানের পাত্র তিনি, যিনি এ সকলের আধার। আরাধনায় আমাদিগকে প্রস্তুত করে, ধ্যান আমাদিগকে সম্পন্ন করে। আরাধনায় আমরা যে যে স্বরূপ বলি, ধ্যানে সে সমস্ত একাধারে দর্শন করিয়া মোহিত হই। আরাধনা মার চক্ষু মনোহর, মুখ উৎকৃষ্ট, কথা সুমিষ্ট এইরূপে তাঁহার গুণের কথা বলিল, ধ্যান আর কোন কথা না বলিয়া কেবল বলিল মা, এই মা, ইনি মা, এখানে মা। ও মা বলিয়া সম্বোধন ইহা ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই স্থানে এই সময়ে মা বলিতে বলিতে নেশ

উপস্থিত, ক্রমে নেশা ঘনীভূত হইয়া বাক্যরোধ। আনন্দ যখন অল্প তখন কথা থাকে, যখন আনন্দ উথলিয়া উঠে, খুব মত্ততা জন্মে, তখন বাক্য বন্ধ হইয়া অবাক্ ধ্যান উপস্থিত হয়, মৌনাবলম্বন উপস্থিত হয়। তখন সাধক মুনি হইয়া একেবারে ব্রহ্মসাগরে ডুবিলেন। যত আস্বাদন করিতে লাগিলেন, তত আর ডুবিতে লাগিলেন। ভ্রমর যখন প্রথম মধুর অন্বেষণ করে, তখন ক্রমান্বয়ে গুন গুন্ করিতে থাকে, যাই পুষ্প পাইল, তাহার চারিদিকে গুন্ গুন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল, ভিতরে যখন প্রবেশ করিল, তখন গুন্ গুন্ শব্দ করিয়া প্রবেশ করিল, যাই মধুপান করিতে লাগিল আর তাহার শব্দ-নাই। মুনি যখন ধ্যানে ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হইলেন, তখন আর তাঁহার কোন শব্দ নাই ; কিন্তু যখন তিনি আরাধনা করিতেছিলেন, স্বরূপ সকল নিরূপণ করি-তেছিলেন, তখন তাঁহার শব্দ ছিল। ধ্যানে প্রবিষ্ট হইয়া যখন মধুপান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সকল শব্দের নিবৃত্তি হইল। যখন এইরূপে হৃদয় আনন্দসাগরে খুব ডুবিল, মন সান্ত্বনা লাভ করিল, তখন তৃতীয় রাজ্যে যাইবার জন্য শঙ্খধ্বনি হইল। পাপী মনুষ্য তোমার অনেক অভাব আছে, এখন তোমার প্রিয় দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছ, এখন যাহা চাহিবার চাহিয়া লও। কি বলিলে, এমন সুখের ধ্যান বন্ধ করিতে হইবে ? আরাধনা করিয়া সুখী হইয়াছি, কিন্তু ধ্যানে যে একেবারে সুখে মগ্ন হইয়াছি। মগ্ন হইয়াছ তাহাতে কি, ইহার মধ্যে যে তোমাকে চৈতন্য রাখিতে হইবে। এমন বক্ষের ধন পাইলে, এমন সুন্দর হরির পুণ্যময় উজ্জ্বল মুখ জাজ্বল্যমান দেখিলে, আহা এমন রূপ যে চক্ষু দিয়া প্রেমধারা বহিল, হরি এত নিকটে, নিকটস্থ বন্ধুর নিকটে এখন চাহিবার সুযোগ দেখিতেছ না। এখন প্রার্থনা আরম্ভ কর। তুমি বলিবে, এখন আমার প্রার্থনা কি ? আমি বলি তোমাকে এ সময়ে প্রার্থনা করিতেই হইবে। অন্ততঃ তোমাকে মার নিকটে এ প্রার্থনাও করিতে হইবে, মা তোমার যে সৌন্দর্য্য দেখিলাম, এ সৌন্দর্য্য যেন এইরূপ চির দিন দেখিতে পাই। পূজার সময়ে এ কথা তোমার বলিতে হইবে, এমন সুন্দর বস্তু যাহা দেখিলাম সংসারে গিয়া যেন ইহা কখন ভুলিয়া না যাই। এখন প্রার্থনা করাই ঠিক অবস্থা। ধ্যানের পূর্ব্বে ঈশ্বরকে দেখিবার পূর্ব্বে, প্রার্থনা হইতে পারে না। ঈশ্বরকে দেখিলে

তবে মনে একটি আদর্শ উদিত হয়, সেই আদর্শ দেখিয়া বুঝিতে পারি তাঁহার নিকটে কি চাহিব। ধ্যানে বুঝিলাম এমন সুন্দর বস্তু, এমন আহ্লাদের সামগ্রী, ইহাঁর সঙ্গে যেন নিরন্তর বাস হয়, পাপ আসিয়া যেন বিরোধী না হয়, বিচ্ছেদ না ঘটায়। মন এই বলিয়া যাই ব্যাকুল হইল, অমনি ধ্যান ছুটিয়া গেল। বিশেষ অবস্থা ধ্যানের অবস্থা, কেন না ইহাতে আদর্শ বোধ-গম্য হয়। আরাধনায় তাঁহার ভক্তবৎসলতা দীন বৎসলতা বিবৃত হই-য়াছে। ধ্যানের সময় হৃদয়নাথ হৃদয়ে প্রকাশিত। এখন মনের অভাব প্রকাশ করা স্বাভাবিক। শব্দ সহকারে মনের কথা মনের ব্যাকুলতা এ সময়ে উচ্চারিত হইবে, শব্দের আকার ধারণ করিয়া অন্তরের কথা গুলি বাহির হইবে। অনেক শব্দ আছে যাহাতে এই সকল আন্তরিক ভাব প্রকাশ পায়। যেমন আমি নরাধম, অত্যন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত, পাপী, দীন হীন, কাঙ্গাল ইত্যাদি। এই সকল কথাযোগে যখন মনের দুঃখ জানাই, যত বলি প্রার্থনা তত ভাল হয়, সুমিষ্ট হয়, ভক্তি ও প্রেম বাড়িতে থাকে। ঠিক অন্তরের ব্যাকুলতার বিষয়টি শব্দে প্রকাশ পাইলে তবে প্রার্থনা হয়। প্রার্থনা করিয়া উহার জন্য কি প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব? প্রার্থনা করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাঁহার অশান্তি চলিয়া গেল শান্তি আসিল, তিনিই যথার্থ সাধক, তিনি প্রার্থনা করিয়া যথার্থ প্রার্থনার বস্তু পাইলেন। আনন্দ মনে "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ" বলিয়া তিনিই কেবল প্রার্থনা শেষ করিতে পারেন। অনেকেই ঈশ্বরকে মা বলিয়া থাকে, কিন্তু জানিতে হইবে কেবল মা বলিবার জন্য উপাসনা প্রার্থনা নয়। ব্রহ্মজ্ঞানীরা অনেক সময়ে ঈশ্বরকে উপলক্ষ করিয়া বক্তৃতা করিবার জন্য, আমি কেমন বক্তৃতা করিতে পারি লোককে শুনাইবার জন্য, প্রার্থনা করেন। এ প্রার্থনায় ফল পাইবার প্রত্যাশা রাখিও না। ভাল করিয়া কথা সাজাইয়া ব্যাকরণ শুদ্ধ করিয়া প্রার্থনা করিলাম, তাহাতে বল আর কি হইবে? যে প্রার্থনা অন্তরের ব্যাকুলতার প্রার্থনা সেই প্রার্থনা ঠিক। যেমন আহার, প্রার্থনা তেমনি। আহার করিতে করিতে শরীর সবল সুস্থ বোধ হয়। উপাসনা করিলাম পরে ফল লাভ হইবে, ইহাতে মনের তৃপ্তি হয় না। দূরবর্ত্তী কোন ফল পরে হয় হউক, কিন্তু উপাসনার সঙ্গে কিছু ফললাভ একান্ত প্রয়োজন।

এই জন্য যেমন প্রার্থনা তেমনি স্পষ্ট উত্তর। আরাধনা ধ্যান—চিত্তের উদ্বোধন। যাই ধ্যানে ঈশ্বরালোকে অন্ধকার ঘুচিয়া গেল, কার নিকটে বলিব স্থির হইল, আনন্দময়ী জননীর প্রতিমা ঠিক চক্ষের সম্মুখে বাহির হইল, প্রার্থনার কথা আপনা হইতে আসিল, প্রার্থনার ফলের বীজ হাত বাড়াইয়া প্রাপ্ত হওয়া গেল। আমরা ধারে উপাসনা করিতে পারি না। আজ প্রার্থনা করিলাম পরশ্ব ইহার উত্তর পাইব, তত ধৈর্য্য ধারণ আমরা করিতে পারি না। অন্ততঃ আংশিক আজ লাভ করিলাম, কল্য অপর অংশ লাভ করিব। আজ রবিবারে মন্দিরে আসিয়া প্রার্থনা করিলাম আজ কিছু বাড়ী লইয়া যাইব, বাঁকি সঞ্চিত রহিল, কল্য সোমবারে না হয় পাইব। অদ্য শূন্য হৃদয়ে বাড়ী কেন ফিরিয়া যাইব? এই ভাবে আজকার জন্য একখানি পাত পাতিব। আরাধনাবাণে হৃদয় ঈশ্বরে বিদ্ধ হইল, ধ্যানে চুপ করিয়া মধু পান করিলাম, প্রার্থনার সময় মার মুখপানে তাকাইয়া হাত পাতিলাম, ভিক্ষা দাও। হাত পাতিয়া কি পাইলে দেখাও। দেখ, কিছু না লইয়া যাইও না। প্রতি দিন যে কয়েকটি উপাসনার অঙ্গের কথা বলা হইল সাধন কর। শুষ্কভাবে উপাসনা পরিত্যাগ কর। নিরাকার ঈশ্বরকে হাতে ধরা বস্তুর ন্যায় ধারণ কর। উদ্বোধন, আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনাতে প্রমত্ত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন কর। নগরে নগরে হরিনাম বিলাও; ভক্তিতে শুদ্ধ এবং পবিত্র হও। যদি সুখী হইতে চাও, প্রকৃত উপাসনা ভিন্ন আর দ্বিতীয় উপায় নাই। এ সংসারে কেবল এক হরিনামানন্দে সকলে পুলকিত ও মত্ত হয়।

দুর্ব্বোধ্য নববিধান।

রবিবার ১০ ই আশ্বিন, ১৮০৩ শক।

ঈশ্বর স্বয়ং সত্যকে দুর্ব্বোধ করিয়াছেন। মনুষ্য সহস্র চেষ্টা করিয়া সহজে কি সত্যকে বোধগম্য করিয়া দিতে পারে? ঈশ্বর যদি আপনাকে আপনি সহজে বুঝিতে না দেন, আমরা কিরূপে বুঝিতে পারিব? যদি তাঁহার শাস্ত্রের কথা তিনি আমাদিগকে অনায়াসে বুঝিতে না দেন, আমরা

তাহা কোন মতেই বুঝিতে পারি না। আমরা ধ্যান করিব, সাধন করিব, কিন্তু মনঃকল্পিত সহজ পথে যাইতে পারিব না। যদি যাই, তাঁহাকে পাইব না; সত্য লাভ করিতে পারিব না। দয়াসিন্ধু নিজে জানেন, কোথায় তাঁহাকে রাখিতে হয়। তাঁহার তেজ অতি ভয়ানক। যদি তিনি আপনাকে সাধকের অতিশয় নিকটস্থ করেন, সাধক তেজ সহ্য করিতে পারিবে না। যদি তিনি আপনাকে অনেক দূরে রাখেন, তাপের অল্পতানিবন্ধন কষ্ট হইবে। ঈশ্বর সূর্য্য হইয়া যদি আমাদিগের স্কন্ধে আসিয়া পড়েন, তুমি সে তেজ সহ্য করিতে পারিবে না। তুমি ইচ্ছা কর, হাত বাড়াইবে, সুফল পাড়িবে, মুখে দিবে, রসাস্বাদন করিবে, মুহূর্ত্তের মধ্যে অশেষ আনন্দ উপভোগ করিবে, কিন্তু তাহা হইবে কেন? এরূপ করিতে কার না আনন্দ হয়? কিন্তু মনুষ্যের বিচার অপেক্ষা ঈশ্বরের সিদ্ধান্ত শ্রেষ্ঠ। সেই সূর্য্য যদি আবার বলেন, এত নিকটে আলোক দুর্ব্বিষহ হইবে; খুব দূরে গিয়া লুকাইয়া থাকি, তাহা হইলে কিছুই বাঁচিবে না। এই জন্য ঈশ্বর নিজ ইচ্ছায় অপনাকে আপনি দুর্ব্বোধ করিলেন। পণ্ডিতেরাও তাঁহাকে সম্যক বুঝিল না। যাহারা জানিল, তাহারা অল্প জানিল। এই যে পবিত্র নববিধান, যাহা পরমবিধান, যাহাকে স্বয়ং স্বর্গীয় সত্য বলিলেও বলা যায়, ইহাও বিধাতার ন্যায় দুর্ব্বোধ। বক্তৃতার পর বক্তৃতা হইল, উপদেশ হইল, পুস্তকের পর পুস্তক সকল প্রকাশিত হইল, কিন্তু মানবসমাজে কে কবে গূঢ় ব্যাপার সকল পরিষ্কাররূপে বুঝিয়াছে? আমরা কিরূপে বলিব, নববিধান পূর্ব্বাপেক্ষা লোকে বুঝিল? প্রাণেশ্বরকে কে কে বুঝিল? পৌত্তলিক ভাইরা কি বুঝিল? জ্ঞানী তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বহুশাস্ত্রজ্ঞানে নিপুণ হইয়া ব্যুৎপন্ন হইয়া কি তাঁহাকে বুঝিল? শাস্ত্রী যাঁহারা, তাঁহারা শাস্ত্রের সঙ্গে মিলাইয়া কি বুঝিলেন? আমাদের ধর্ম্মকে হৃদয়ের সহিত কি গ্রহণ করিলেন? আমরা রাস্তার লোকের কাছে নববিধানকে প্রকাশ করিবার জন্য কত চেষ্টা করিলাম, ধনীর প্রাসাদে, ও নীচতম কুটীরবাসী দুঃখীর নিকটে ব্রহ্মগান শুনাইলাম, কিন্তু কে বুঝিল? সংগীত দ্বারা প্রচার করিলাম, নানা ক্রিয়া কর্ম্ম দ্বারা কত বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম, সকলই ব্যর্থ হইল। নিশান প্রভৃতি, হোম প্রভৃতিও তেমনই নিষ্ফল হইল। আমরা

স্ত্রীজাতির জন্য অমিয় মাখিয়া হরিনাম সহজ ও মিষ্ট করিয়া দিলাম, কে বুঝিল? বালকদিগের জন্য এরূপ করিলাম, যাহাতে তাহাদের ক্ষুদ্র হস্ত ধরিতে পারে, কিন্তু কে ধরিল? আমরা ইংলণ্ডের জন্য বিজ্ঞানসঙ্গত পদ্ধতিতে নববিধানকে প্রকাশ করিলাম, কিন্তু কার কার মস্তিষ্কে তাহা প্রবিষ্ট হইল? কোন কোন ব্যক্তি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, চারি দিকে আনন্দধ্বনি হউক; কেন না নববিধান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে!! পূর্ব্বাঞ্চল, আসিয়াখণ্ড, পূর্ব্বজাতির মধ্যে হৃদয়ের পূর্ব্বসংস্কারের সাহায্য পাইয়া কই নববিধান কে বুঝিল? পশ্চিমাঞ্চল কই ইহাকে আদর করিল? পূর্ব্ব পশ্চিম কেবল হাহাকার করিল; বিদ্বান্ মূর্খ কেবল নিরাশ হইয়া ফিরিল। হে ঈশ্বর, তোমার নববিধান কি দুর্ব্বোধবস্তু; বিনা আয়াসে এত বড় ধর্ম্ম কিছুই বোঝা যায় না। যাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না, তাঁহারা ইহার প্রতি দোষারোপ করিলেন। যাঁহারা ধরিতে পারিলেন না, তাঁহারা ইহাকে হেয় জ্ঞান করিলেন, যে দেশ ইহাকে গ্রহণ করিতে পারিল না সে দেশ ইহাকে ঘৃণা করিল। যে ইহার মর্য্যাদা করিতে পারিল না, সে ইহাকে অপদস্থ করিল। যে হরির চরণশোভা দেখিতে পাইল না সে হরিকে বিদায় করিয়া দিল। কেন না সে হরিকে না বুঝিলে কল্পনার হরিকে ত হৃদয়ের সিংহাসনে বসাইতে পারে না। ব্রহ্মভক্ত কি বিবেচনা কর? সময় কি আসিবে? উপায় কি আছে? যাহাতে লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। দুই তিন বৎসরের পরীক্ষা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছে, যতই সাধুদের সমাগম হইতেছে, যতই শাস্ত্রসংখ্যা বাড়িতেছে, ততই যেন আমাদের ক্ষেত্র সুবিস্তৃত হইতেছে; ততই লোকে বুঝিতেছে না। এত বড় সমুদ্র সমান ধর্ম্ম। কিরূপে বুঝিবে? এক ঈশার ধর্ম্ম বুঝিতে দুই সহস্র বৎসর গেল; এক হিন্দুধর্ম্ম বুঝিতে চারি হাজার বৎসর অতীত হইল। এখন নববিধানে বিস্তৃত ধর্ম্ম দেখিয়া যাত্রীরা ভয় পাইল। এক ঈশা, এক মুষা, এক বুদ্ধ, এক শ্রীগৌরাঙ্গকে বুঝিতে কত চেষ্টা করিয়া পৃথিবী পারিতেছে না; এমন সময় নববিধান আসিয়া চারি জনকে এক জন করিতে চাহিতেছেন; চারি জনের মিলন করিতেছেন, ইহা পৃথিবী কিরূপে বুঝিবে? বৈরাগ্য কি তাহা লোকে বুঝিতে পারে, সংসার কি,

তাহাও বোঝা যায়, কিন্তু নববিধান যদি বলেন, সংসারও যা, বৈরাগ্যও তা, অমনি আর লোকে বুঝিতে পারে না। আপনার স্ত্রী পুত্র লইয়া গৃহ কর্ম্ম করার যে পথ, সন্ন্যাসী হইবারও সেই পথ ;—আর লোকে বুঝিল না। যোগ কি, বড় বড় যোগী যখন বুঝাইতে পারিলেন না, ভক্তি কি, সহস্র সহস্র ভক্ত যখন ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম হইলেন, তখন নববিধানের পরী আকাশে উঠিয়া বলিতেছেন, যোগের পথে গেলে ভক্তিকে পাওয়া যায়, ভক্তির পথে গেলেও যোগকে পাওয়া যায়। কি অসম্বদ্ধ কথা!! মনে মনে আলোচনা করিয়া কতরূপে বুঝাইতে গেলাম, ততই লোকে বুঝিল না। ভ্রম দূর করিবার জন্য কত যত্ন করিলাম, বিফলপ্রযত্ন হইলাম। অন্যান্য ধর্ম্মের প্রারম্ভেও এইরূপ। কোন্ ধর্ম্মের আরম্ভে লোকে না বিদ্রূপ করিয়াছে ও খড়্গহস্ত হইয়াছে? প্রাণের ভাই সব রক্ত দিয়া গেলেন, তথাপি তাঁহাদের ধর্ম্ম লোকে বুঝিল না, তার উপর নববিধান কেবল যোগী নন, কিন্তু মহাযোগী, কেবল ভক্ত নন, কিন্তু মহাভক্ত; কেবল উৎসব নয়, ইহাঁর মহা উৎসব। মহাবুদ্ধি মহাজ্ঞান, মহাবিদ্যা স্বয়ং না আসিলে ইহাঁকে বুঝিতে পারা যায় না। ইহাঁর কালী মহাকালী, ইহাঁর ব্রত মহাব্রত। আমরা বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে ইহাঁর বিপক্ষে অনেক অমূলক অসত্য শুনিতেছি। কেন শুনিতেছি? যাঁহারা ইহাঁর প্রচারোদ্যোগী, তাঁহাদিগের অবর্ত্তমানেও নহে। যখন তাঁহারা বর্ত্তমান, যখন প্রত্যেকের মুখ হইতে বক্তৃতার পর বক্তৃতা দ্বারা নববিধান প্রচারিত হইতেছে, পুস্তকের পর পুস্তক লেখা হইতেছে, তখন ইহা এত কি দুর্ব্বোধ, যে অনেকে বুঝিতেছেন না। পর ব্রহ্ম যদি বল, লোকে বুঝিতে পারে কিন্তু হরিব্রহ্ম বলিলে আর লোকে বুঝিতে পারে না। হরিনাম যদি বল, শ্রীগৌরাঙ্গের হরিনাম সকলেই বুঝিবে; আমরা হরিনাম করিলেই আর কেহ বুঝিবে না। বেদ বুঝিল, পুরাণ ও বুঝিল; যাই বলি বেদে পুরাণ, বেদ আর কেহ বুঝিতে পারে না। অনন্ত কালের সত্য বুঝিবার পক্ষে ধৈর্য্য ধরিতে হইবে। ঈশ্বরপ্রসাদে নববিধানকে আমরা যেন আরও দুর্ব্বোধ করিতে পারি। যদি লোকে ইহার প্রেমকে বুঝিতে না পারে, আমরা আরও প্রেম দেখাইব, প্রেমের মাত্রা বৃদ্ধি করিব। জাতিভেদকে উঠাইতে

গেলে যদি লোকে না বোঝে, আমরা সকলভেদ উঠাইব। পিতা পুত্রে অভেদ, শাস্ত্রে শাস্ত্রে অভেদ, ইহ পরলোকে অভেদ প্রচার করিব। সর্ব্বত্যাগী হইতে হয়, তাহাও হইব। সময় আসিলেই লোকে বুঝিতে পারিবে। যখন ছয়টা বাজে নাই, তখন বার টার সূর্য্যকে কেমন করিয়া দেখাইব? তখন ঘড়ির দিকে দেখাইয়া কিছু ক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে কহিব। যখন সময় হয় নাই, তখন ঈশা, মুষা, শাক্য, চৈতন্যের মিল কে বুঝাইবে? আমাদের সকলে এক এক জন নারদ ও এক এক জন যাজ্ঞবল্ক্য হউন। তাঁহারা বীণা বাজাইয়া যোগতত্ত্ব প্রকাশ করুন, তবে ত লোকে বুঝিবে। দুই ঘণ্টার যোগ বুঝিতে পারিতেছে না, তুমি যোগের মাত্রা বৃদ্ধি কর। তুমি কি যোগ কমাইতে চাও, লোকে দুই ঘণ্টার যোগ বুঝিতে পারিল না বলিয়া? তুমি মূর্খকে বুঝাইবার জন্য কি মূর্খ হইবে? যদি যোগ বুঝাইতে চাও, খুব যোগী হও। যখন সকলে দেখিয়া হতাশ হইবে, তখন সকলেই বুঝিবে। হিমালয়ের উচ্চস্থানে বসিয়া যোগ সাধন কর, নিবিড় জঙ্গলে বসিয়া যোগ সাধন কর। সজনে নির্জ্জনে খুব যোগ সাধন কর; নতুবা লোকে বলিবে, তুই মানুষ, পাপ রাখিয়াছিস্ হৃদয়ের মধ্যে, তোকে কেন যোগী বলিব? ঈশার নাম করিবে, মুষাকে শিরোধার্য্য করিবে, আর চৈতন্যকে অপমান করিবে, ইহা হইলে হইবে না। হিমালয়ের উপর বসিয়া যোগ কর, লোকে না বুঝিয়াও বুঝিবে। লোকে বলিবে, আমরা মহাযোগীকে না বুঝিয়াও বুঝিব; অযোগীকে কিছুতেই পারিব না। মহাযোগীর ভিতরের কার্য্যপ্রণালী না জানিয়াও জানিল। প্রেমের অবতার, ভাবের অবতার, যোগের অবতার যাঁহারা লোকে তাঁহাদিগকে না বুঝিয়াও বুঝিতে পারে। তুমি যদি কাহাকেও ভাল বাসিতে পার না, তোমাকে কি বুঝিবে? লক্ষ লক্ষ বার যদি বলিতে পার, "আমায় মারিলি কলসীর কাণা, তাই বলে কি প্রেম দিব না," তোমাকে সকলেই বুঝিবে। যখন প্রেমে উন্মত্ত হইবে, যখন দেখিবে, নববিধানের লোকে এত দিনের পর বুদ্ধিহীন হইয়াছে, সবাই নির্ব্বোধ, পাগল, ব্রহ্মেতে বিলীন, তখন নববিধানকে সহজে লোকে বুঝিবে। বুদ্ধকে কিছু কিছু লোকে বুঝিতে পারে, তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যদিগকে কিরূপে বুঝিবে? যাহাদের ভিতরে এক রকম, তাহাদের

বোঝা যায়, যাহাদের ভিতরে পাঁচ খানা পাঁচ রকম, তাহাদের কিরূপে বুঝিবে? নববিধান দুর্ব্বোধ হইয়াছে, অনেকে বুঝিতে পারিতেছে না, এই দোষ হইতে যদি ইহাকে মুক্ত করিতে চাও তবে আরও যাতে দুর্ব্বোধ হয়, তাহার চেষ্টা কর। আমার ক্ষুদ্র সিদ্ধান্ত বুঝাইবার চেষ্টা করিলে কি হইবে? অতএব উপাসনা এখন এজন্য যে, যাহাতে নববিধান আর ও দুর্ব্বোধ হয়, ঘৃণার পর ঘৃণা যাহাতে আর‌ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যে দিনে নববিধানকে স্বর্গীয় বলিয়া লোকে বুঝিবে, সে দিন সমাগত হইবে। যে রাজ্যে তেল জল একত্রিত হয় না ভাই ভাই পরস্পর প্রাণনাশের চেষ্টা করে, সে রাজ্যে নববিধানকে কিরূপে বুঝিবে? সেখানে যদি বুঝাইতে যাও, পৃথিবীর অসদ্দৃষ্টান্তে যদি ইহাকে বোধগম্য করিতে চাও, কেহই বুঝিবে না। তুমি বলিলে, ঈশ্বরকে আমি দেখিয়াছি, লোকে তোমার কথা বুঝিল না; তুমি বল তাঁহাকে আমি স্পর্শ করিয়াছি। যদি তাহাতে ও না বুঝিতে পারে, বল আমি চব্বিশ ঘণ্টা ঈশ্বরের ভিতর ঘুমাইয়া থাকি। তুমি বলিলে, ভক্তি এমনি যে, চরণ জড়াইয়া ধরিয়া থাকি। লোকে বুঝিল না, বল, সুন্দর গোলাপ ফুলকে আমি বুকে করিয়া রহিয়াছি। অবশেষে যখন দেখিবে তুমি পাগল হইয়াছ, তখন বুঝিতে পারিবে। যেমন পাগলকে যে পাগল হয় নাই সে বুঝিতে পারে, সেরূপও বুঝিবে। ধ্যানের সময় যদি কম কর, প্রার্থনার ভাব যদি সহজ হয়, তাহা হইলে লোকে কখনই নববিধানকে বুঝিতে পারিবে না। নাচের পর গান, গানের পর নাচ, হাস্যের পর ক্রন্দন, ক্রন্দনের পর হাস্য হইতে থাক, ক্রমে নববিধানকে বুঝিবে। কেবল কাঁদিতেছ, ইহা লোকে বুঝিতে পারে; কেবল হাসিতেছ, ইহাও লোকে বুঝিতে পারে। কিন্তু হাস্য ক্রন্দন, ক্রন্দন হাস্য বুঝিতে পারে না। খুব দুর্ব্বোধ হইলে বুঝিবে। জানে না পৃথিবী; আমরা কিরূপ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি। এক জন স্বর্গ হইতে বলিতেছেন, আর আমরা লিখিতেছি। এই সকল অহঙ্কারের কথা শুনাইতে হইবে। আরও অহঙ্কারী নীচ ঘৃণিত বলিয়া যাহাতে লোকে আমাদিগকে আরও ঘৃণা করিতে পারে, এরূপ করিতে হইবে। কি করিব? আমরা দুর্ব্বোধ নববিধানের পাল্লায় পড়িয়াছি। আরও দুর্ব্বোধ ব্যাপার সকল স্বর্গ হইতে হুড় হুড় করিয়া

আসিতেছে। আমরা কয়েকটী ভাই এমনই যোগ প্রেম সাধন করিব, যে ইহা আরও দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিবে। যে বুঝিবে না, তাহাকে আমরা কি করিব? আমরা বুঝাইতে আসি নাই, পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। কোন ধর্ম্ম প্রচারকই সম্যক্‌রূপে বুঝাইয়া দিবার জন্য আসেন নাই। ঈশ্বর স্বয়ং যখন দুর্ব্বোধ, তখন আমরা কি ঈশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ করিব? যদি দুর্লভ সুলভ হয়, তা হলে যে মরিব। নববিধান যদি সামান্য হয়, তবে যে সকলই ব্যর্থ হইয়া যায়। হরি, যেন না বোঝে। যেন খুব সাধন কষ্টের ভিতর দিয়া লোকে নববিধানের মধ্যে আসে। যোগ্য কি যে তাহারা ইহা বুঝিবে? যাহারা আমাদের হরিকে কটু কহে, স্বর্গীয় সাধুদিগকে অবিশ্বাস করে, ঘৃণা করে, হরির চরণে ধরিয়া কাঁদিব যেন তাহারা না বোঝে। যাহা-দের বুঝাইতে হয়, তিনি বুঝাইয়া দিবেন। বাড়াও, সাধনের মাত্রা আরও বাড়াও। আমরা যেন পশ্চাদ্‌গমন না করি। আরও উপাসনা সুমধুর কর। রাস্তার মধ্যে দাঁড়াইয়া বল, "ঈশ্বর এখানে যে হঠাৎ?" এক দিন "ঈশ্বর দাঁড়াও ঈশ্বর দাঁড়াও" বলিয়া দৌড়িয়া যাও। লোকে বলিবে, রাস্তার মাঝে দৌড়িতেছে কে? তুমি একে বারে প্রেমে যোগে উন্মত্ত হইয়া যাও। একটী ছোট গাড়ী হাতে করিয়া হরিকে লইয়া রাস্তায় যাও। লোকে হাসিবে, পাগল বলিবে, নববিধান বুঝিবে। আশি বৎসরের বৃদ্ধের বালকের ন্যায় ব্যবহার হউক। ভয় কি? বালকের পথে, পাগলের পথে, মাতালের পথে না চলিলে নববিধান বুঝিবে না। যখন তিনের লক্ষণাক্রান্ত হইবে, লোকে তখন বুঝিবে, নববিধান কেমন।

বিজয়নিশান।

রবিবার, ৪ মাঘ, ১৮০২ শক।

অদ্য শুভ দিনে ব্রহ্মমন্দির আপনার শিরোদেশে বিজয়নিশান উড়া-ইলেন। ইতিহাস ইহা লিখিবে। ভবিষ্যদ্বংশেরা ভাবিবে ব্রহ্মমন্দির কেন এই সময়ে বিজয়ের চিহ্নস্বরূপ পতাকা আপনার মস্তকে ধারণ করি-লেন। এই ব্যাপারে কি পরিবর্ত্তন প্রদর্শিত হইতেছে? কোন্ ভাবব্যঞ্জক

এই ব্যাপারটি? ভবিষ্যতে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি আপন আপন বুদ্ধি অনুসারে এই ঘটনার তাৎপর্য্য বিচার করিবে। অতএব সর্ব্বাগ্রে আমাদিগের পক্ষে এই ঘটনার অর্থ নির্দ্ধারণ করা উচিত। তোমরা কি মনে কর, এই রজতধ্বজার কোন নিগূঢ় আধ্যাত্মিক অর্থ নাই? এই সময়ে এত বৎসর পরে হঠাৎ করিয়া ব্রহ্মমন্দিরের মস্তকে একটী ধ্বজা কেন উঠিল? ইহার ভিতরে নিশ্চয়ই কোন গূঢ় অর্থ আছে। যখন কোন পুরুষ দক্ষিণবাহু প্রসারণ করিয়া নিশান ধারণ করেন, তখন তিনি স্বীয় বীরত্বের পরিচয় দান করেন। যখন তিনি কথোপকথন, আহার শয়ন প্রভৃতি জীবনের সামান্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন তখন লোকে জানে তিনি মনুষ্য; কিন্তু যখন তিনি বলে কৌশলে আপনার শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়া নিম্নে ফেলিয়া নিশান হাতে ধরিয়া বলেন আমি দিগ্বিজয়ী, তখন লোকে জানিতে পারে যে তিনি এক জন বীর। যুদ্ধে শত্রুদিগকে পরাজয় করিয়া বিজয়নিশান ধারণ করিলে বীরত্বের পরিচয় দেওয়া হয়। যুদ্ধক্ষেত্রের সঙ্গে পতাকার সংযোগ। যে বীর যোদ্ধা রণে জয়ী হয় তাহারই বিজয়নিশান ধারণ করিবার অধিকার হয়। ভীরু কাপুরুষ নিশান ধরিতে পারে না। সাহসবিহীন ভীরু কিরূপে জয়ী বীরের নিশান কলঙ্কিত করিবে? যখন রণক্ষেত্রে দুই দলই সমান ভাবে আপন আপন পরাক্রম প্রকাশ করে তখন লোকে জানে কোন পক্ষের জয়পতাকা উড়াইবার সময় হয় নাই। দুই পক্ষের তুমুল যুদ্ধ হইতেছে, দেখিতে দেখিতে রণ ঘোরতর হইয়া উঠিল, লোকে মনে করিল এমন ভয়ানক যুদ্ধ কখনও দেখি নাই। এমন সময় গভীর জয়ধ্বনি সহকারে এক দলের জয়পতাকা গগনে উঠিল। এক দল ঝঙ্কার করিয়া জয় বাদ্য বাজাইল এবং গগনে জয়নিশান উড়াইল। পৃথিবীকে নববিধানের জয় দেখাইবার জন্য এই বিজয় নিশান উড়িল। নববিধানের বল, পরাক্রম এবং বিজয় নিশান আমি দেখিলাম, তুমি দেখিলে, বঙ্গদেশ দেখিল, সমস্ত ভারত দেখিবে, চীন হইতে আমেরিকা পর্য্যন্ত সমস্ত পৃথিবী দেখিবে। নববিধান হিন্দুস্থান জয় করিবে, সমস্ত পৃথিবী জয় করিবে। আজ আমরা ব্রহ্মমন্দিরের চূড়ার উপরে বাহিক বিজয়নিশান উড়াইলাম; কিন্তু যথার্থ বিজয়নিশান এই নববিধানের মস্তকের উপরে।

সকল জাতি যথাকালে এই নববিধান গ্রহণ করিবে। সর্ব্বত্র নববিধানের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে, নববিধান সকল দেশ অধিকার করিবেন। ইনি নানাপ্রকার শত্রু নিপাত করিবেন। কুসংস্কার ও পাপ অধর্ম্মের বুকে দুই পা দিয়া নববিধান দাঁড়াইলেন। এই জন্য যে সকল কাপুরুষ, ব্রাহ্ম এখনও সম্পূর্ণরূপে কুসংস্কার ও পাপ পরিত্যাগ করে নাই, এখনও যাহারা পাপের দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিতে চাহে, তাহারা সকোপে বলিতেছে দূর হউক নববিধান, দূর হউক ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির। তাহারা মনের সহিত নববিধানকে চির দিনের জন্য অভিসম্পাত দিতেছে। তাহারা মনে করিত এই ব্রহ্মমন্দির সাহসবিহীন কাপুরুষদিগের ব্রহ্মমন্দির; কিন্তু এখন তাহারা ব্রহ্মমন্দিরের দুর্জ্জয় তেজ সহ্য করিতে পারিতেছে না। ব্রহ্মমন্দির আপনার মস্তকে বিজয়নিশান উড়াইলেন দেখিয়া তাহারা ভয়ে পলায়ন করিতেছে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে কুসংস্কার ও পাপের সংস্রব পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহে। তাহারা জানিত ব্রহ্মমন্দির ভীরুতার স্থান, এখানে সাহস এবং জলন্ত উৎসাহের মৃত্যু হয়; কিন্তু তাহারা দেখিতেছে যে বৎসর বৎসর ইহার বল পরাক্রম ও সাহস বৃদ্ধি হইতেছে, সুতরাং তাহারা ইহার তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া দলে দলে সংসারের দিকে অসত্য অধর্ম্মের দিকে পশ্চাৎ গমন করিতেছে। কিন্তু যে সকল সাহসী ধর্ম্মবীর এখনও ইহার মধ্যে রহিয়াছেন ইহাঁদিগের ভিতর হইতে সহস্র সহস্র লোক উঠিবে। নববিধানের বিজয়নিশান উড়িল আর কি এখন কেহ বলিতে পারে যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুধর্ম্মের একটী দুর্ব্বল শাখা? নববিধান কোন একটি বিশেষ ধর্ম্মের পক্ষপাতী নহে। সময়ে ধর্ম্মবিধান পূর্ণ করিবার জন্য ইহাঁর আগমন। ব্রহ্মমন্দির, আজ তোমার মস্তকের উপরে নববিধানের বিজয়নিশান উড়িল, আজ তুমি নববিধানের জয়ধ্বনি করিয়া হুঙ্কার রবে তোমার সন্তানদিগকে কাঁপাও। ব্রহ্মমন্দির, আজ তোমার মাথার উপরে বিজয়-পতাকা উড়িতেছে, আজ তুমি তোমার রাজার জয়ধ্বনি করিয়া পৃথিবীকে কাঁপাও। তুমি কি সামান্য রাজার প্রজা? তোমার রাজার প্রতাপে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড কাঁপে। ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকগণ,

আর তোমরা ভীরু কাপুরুষদিগের সঙ্গে থাকিও না, এখন দুর্জ্জয় সাহস ও অপ্রতিহত পরাক্রমের সহিত ঈশ্বরের জয় ঘোষণা কর। এই লও বিশ্বাসের বর্ম্ম, এই লও স্বর্গীয় সাহসের ঢাল, এই লও শান্তি অসি. এই সকল স্বর্গের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অসত্যের বিরুদ্ধে, অপ্রেম অধর্ম্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর। আজ দেখ ব্রহ্মমন্দির নড়িলেন, আজ একখানি অতি সুপরিষ্কৃত রজতধ্বজা মস্তকে ধারণ করিয়া ব্রিটিষ রাজ্যে মস্তক উত্তোলন করিয়া ব্রহ্ম-মন্দির দাঁড়াইলেন। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, তোমরা সকলে সাক্ষী হও; আজ ব্রহ্মমন্দির বিজয়পতাকা আপনার মস্তকে ধারণ করিলেন। এই পতাকা ধারণ করিয়া ব্রহ্মমন্দির সমস্ত পৃথিবীর নিকট নববিধানের জয়, ঈশ্বরের জয় ঘোষণা করিতেছেন; এবং সিংহ রবে বলিতেছেন;—"আমার নববিধানাশ্রিত কোন সন্তান মরিবে না, আমার প্রত্যেক সন্তান অমর।" আজ প্রকাণ্ড বিশ্বাস এবং প্রবল উৎসাহে ব্রহ্মমন্দিরের বক্ষ স্ফীত হইতেছে। যদি বল অন্যান্য দিন কি ব্রহ্মমন্দিরের উৎসাহ বিশ্বাস কম ছিল, কম কি অধিক এক বার নিশানের দিকে তাকাইয়া দেখিও। এই ব্রহ্মমন্দিরে যাহা শুনিয়াছি তাহাই বলিতেছি। ইঙ্গিত হইল উপর হইতে, শত্রুকে ভয় করিও না, শত্রুতা দ্বারা পরাস্ত হইও না, শত্রুকে প্রেম দ্বারা পরাস্ত কর। ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মভক্তদিগের মনে শক্তি সঞ্চার হইল, রাজার ভাব প্রস্ফুটিত হইল। বিজয়নিশান ব্রহ্মভক্তদিগের বীরত্বের পরিচয় দিতেছে। কএক বৎসর হইতে শত্রুদিগের উৎপাতে নববিধানাশ্রিতদিগের বীরত্ব বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে। যেখানে বীরত্ব, যেখানে জয় সেই স্থানেই ঝণ্ডা। এই নববিধান রাজা হইয়া পৃথিবীতে রাজ্য বিস্তার করিতে আসিয়াছেন। নববিধান এই ধরাধামে রাজাধিরাজের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন। নববিধানের প্রেরিত দূতগণ যে দেশে যাইবেন এই বিজয়-নিশান সঙ্গে লইয়া যাইবেন। আগামী রবিবারে আমরা এই মন্দিরে এই বিজয়নিশান প্রতিষ্ঠিত করিব। ভারতবর্ষের যে সকল ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নববিধান-বাদীদিগের সমাজ আছে সে সকলস্থানে এই নিশানের প্রতিনিধি নিশান উড়িবে। প্রত্যেক ভক্তের বাড়ীতে এই বিজয়নিশান থাকিবে। যেখানে যেখানে নববিধানের মন্দির আছে সে সকল স্থানে প্রত্যেক মন্দিরের

মস্তকে এই বিজয়-নিশান সংলগ্ন থাকিবে। হে বিশ্বাসী নরনারীগণ, তোমরা এই বিজয়নিশানকে বিশ্ববিজয়ী ঈশ্বরের জয়নিদর্শন জানিয়া ইহার আদর কর, ইহাকে বরণ কর, ইহা দর্শন করিয়া স্বর্গীয় বীরত্ব ও পরাক্রম লাভ কর। এক বার এই প্রকাণ্ড নিশান ধরিয়া দাঁড়াও। বিশ্ব-বিজয়ী ধর্ম্মরাজের জয়নিশান স্পর্শ করিয়া কে ভীরু থাকিতে পারে? যে এই জয়ধ্বজা স্পর্শ করিল তাহার আর ভয় ভাবনা কি? এই জয়-ধ্বজা দর্শন মাত্র ষড়রিপু আপনা আপনি পলায়ন করে। আজ ব্রহ্মমন্দিরের মস্তকের উপরে জয়ধ্বজা উড়িল, আজ সেই দুর্দ্দান্ত শত্রুগণ, সে সকল দৈত্য দানব কোথায়? যাঁহারা জয়ধ্বজা উড়াইলেন, তাঁহাদিগের মনের ভিতরে আর ভয় নিরুৎসাহ রহিল না। যে সকল ধর্ম্মবীর 'আত্মজয় করিয়া আত্মজয়ী হইয়াছেন তাঁহারাই নববিধানের জয়ধ্বজা স্পর্শ করিবার অধিকারী। ভীরু অবিশ্বাসীর কি সাহস যে এই নববিধানের বিজয়-নিশান স্পর্শ করে? কাহারা নববিধানের জয়ধ্বজা ধরিলেন? যাঁহারা আপন আপন মনের শত্রু সকল দমন করিয়া আত্মজয়ী হইয়াছেন। যাহারা আপনার অন্তরস্থ শত্রুসকল দমন করিতে পারে নাই তাহারা বাহিরের শত্রুদিগকে কিরূপে পরাস্ত করিবে? হে নববিধানবাদী, তুমি ধন্য, কেন না যে নববিধান পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্মবিধানকে আলিঙ্গন করিয়াছে, তুমি স্বহস্তে সেই বিধানের জয়ধ্বজা উড়াইলে। বিশ্বাসী বন্ধুগণ, তোমরা দলে দলে এই নিশান উড়াইয়া ঈশ্বরের জয়, নববিধানের জয় ঘোষণা কর। আজ হইতে তোমরা বিশেষরূপে পৃথিবীর অধর্ম্ম কুসংস্কার পাপ তাপ, শোক মোহ বিনাশ করিবার জন্য যোদ্ধা নিয়োজিত হইলে। সর্ব্বত্র ঈশ্ব-রের জয়পতাকা উড়াইয়া পৃথিবী হইতে কাম ক্রোধাদি ষড়রিপু দূর করিয়া দেও। প্রত্যেক ভক্ত গৃহস্থের বাটী এক একটি নববিধানের দুর্গ হউন, এবং তাহার মস্তকে বিজয়নিশান সংলগ্ন হউক। যে বিজয়নিশা-নের প্রতাপে পৃথিবী হইতে সকল প্রকার অধর্ম্ম এবং অসত্য চলিয়া যাইবে সেই বিজয়নিশান আজ ভাল করিয়া ধারণ কর। আগামী রবি-বারের জন্য প্রস্তুত হও। নগরকীর্ত্তন সমাধা হইলে ব্রহ্মবাদিনী কুল-কামিনীগণ এই বিজয়-নিশানকে বরণ করিবেন। প্রাণের ভাই বন্ধুগণ,

ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে তোমাদিগের প্রতিজনের মনে তেজ বীর্য্য সঞ্চারিত হউক। তোমরা সকলে শত্রুদিগকে জগতের রাণীর অসুর-নাশিনীর ভয়ঙ্করা তারা মূর্ত্তি দেখাইয়া তাঁহার ভক্তদিগকে রক্ষা কর। জগজ্জননীর নববিধানের জয়ধ্বজা ধরিবার জন্য তোমরা প্রস্তুত হও।

ঈশ্বরের সখ্যভাব।

১১ই মাঘ, রবিবার, ১৮০২ শক, প্রাতঃকাল।

এই নবধর্ম্মবিধানে যাহা এখন হইতেছে পৃথিবী তাহা পরে বুঝিতে পারিবে। বুঝিবার সময় এখনও হয় নাই এখন দেখিবার সময়, সংভোগ করিবার সময়, মত্ত হইবার সময়। এ সকল ঘটনা লেখক লিখিবে, ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবে। যে ব্যাপার বর্ত্তমান সময়ে ঘটিতেছে, ইহা সর্ব্বদা ঘটে না। অনেক শতাব্দীর অন্ধকারের পরে একেবারে এক নব সূর্য্য বঙ্গদেশের আকাশে, ভারতের আকাশে উদিত হইয়াছে। ঈশ্বরের চরণে প্রণাম করিয়া ইতিহাসলেখক ভারতের প্রতি, জগতের প্রতি ঈশ্বরের এই বিশেষ করুণা, এই নববিধান-মাহাত্ম্য বর্ণনা করিবে। আমাদিগের প্রতি ঈশ্বরের এত দয়া কেন হইল? শরীর দিয়াছেন, শরীর রক্ষার জন্য দয়া করিয়া অন্ন বস্ত্র দিতেছেন, মন দিয়াছেন, মনের উন্নতির জন্য জ্ঞান বিতরণ করিতেছেন, আত্মা দিয়াছেন, আত্মার জীবন জন্য ধর্ম্ম দিয়াছেন, আবার আমাদিগের নিকট নববিধান প্রেরণ করিলেন কেন? গত মাঘ মাসের ব্রহ্মোৎসবে নববিধান জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এক বৎসরের মধ্যে নববিধান শিশুর বাহুবল ভারতবর্ষ বিলক্ষণরূপে অনুভব করিয়াছে। এক বৎসর হইল বঙ্গদেশ নববিধানশিশুকে ক্রোড়ে লইয়া কত আদর করিল; আজ ঈশ্বরের বন্ধুগণ বিশ্বাসী ভক্তগণ এই শিশুর অঙ্গ লাবণ্য সাহস, বীরত্ব, এবং স্বর্গীয় পরাক্রম দেখিয়া সুখী হইতেছেন। বঙ্গমাতা কি আমাদিগকে এই জন্য তাঁহার গর্ভে স্থান দান করিয়াছিলেন যে আমরা এই নববিধানের বিশেষ সৌভাগ্য সম্ভোগ করিব? পৃথিবীতে

অতি অল্প লোকই এই সৌভাগ্য ভোগ করিতে পায়। কখন কোন কালে যুগ যুগান্তরে পৃথিবীতে এক একটি ধর্ম্মবিধান প্রেরিত হয়। চারি শত বৎসর হইল শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে ভক্তিবিধান প্রচার করিয়াছিলেন। চারিশত বৎসর পরে আবার কেন বঙ্গদেশে নববিধানের সুসমাচার শুনিতেছি? নববিধান-বিশ্বাসী ভাই, এই বর্ত্তমান সময়ে তোমার আমার সৌভাগ্য মানিতে হইবেই হইবে। কেন আমরা এত সৌভাগ্যশালী হইলাম? এত বড় ধন বিধানরত্ন ঈশ্বর কেন আমাদের হাতে আনিয়া দিলেন? আমরা যে ঈশ্বরের বিশেষ করুণাপাত্র হইয়াছি ইহা স্বপ্ন নহে, ইহা জীবনের পরীক্ষিত সত্য, ইহা অভ্রান্ত সত্য। ঈশ্বর প্রসন্নমুখে বলিতেছেন,—"সন্তানগণ, এই নববিধানরত্ন গ্রহণ কর।" ঈশ্বরের প্রসন্নতায় সত্য সত্যই আমরা তাঁহার নববিধানভুক্ত হইলাম। প্রাচীন কালের এক একটি বিধানে এক এক জন মহাপুরুষ নেতা হইতেন, সমস্ত জগৎ তাঁহারই মাথায় মহিমার মুকুট পরাইয়া দিতেন। এবারকার নববিধান সেরূপ নহে। এবার ঈশ্বর তাঁহার দয়াকে ছড়াইয়া দিলেন, এবার কেবল কোন একটি সাধুর নামে তিনি বিধান প্রেরণ করিলেন না; কিন্তু ঈশ্বর পৃথিবীর সমুদয় সাধুদিগকে একত্র করিয়া এই নববিধান গঠন করিলেন। পৃথিবীতে সাধুজীবনরূপ যত ফোয়ারা ছিল, এই নববিধানের শুভাগমনে সে সমস্ত খুলিয়া গেল। পৃথিবীর সমুদয় জাতি এবং সমুদয় ধর্ম্মবিধান এই নববিধান সমুদ্রে ডুবিল। এমন কাল ছিল যখন প্রাচীন ধর্ম্মবিধানে বিশেষ বিশেষ লোক একাকী ব্রহ্মচরণে বসিয়া সুধা পান করিতেন, কিন্তু বর্ত্তমান বিধানে সেই রূপ স্বতন্ত্র নির্জ্জন সাধনের বিধি নাই। এই বিধান একটি দলের বিধান। ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে যুগে যুগে সাধুবন্ধু বিধান গঠন এবং স্থাপন করিয়াছেন, এবার দীনবন্ধু আপনার নামে এই বর্ত্তমান বিধান গঠন করিতেছেন। হে লীলাময়সময় হরি, হে ভক্তবৎসল বিধাতা, তুমি দেশে দেশে যুগে যুগে এক এক জন সাধুর মাথায় মুকুট পরাইয়াছ, এবং সেই সাধুকে তোমার প্রেরিত বলিয়া জগতের নিকট আদৃত করিয়াছ। "যুগে যুগে বিধি করিয়া প্রচার, ভক্ত সঙ্গে কত করিলে বিহার।" সাধুদিগের সঙ্গে হে হরি, তুমি কত আমোদ করিয়াছ; কিন্তু আজ হরি,

তোমাকে কাঙ্গালের বাড়ীতে যাইতে হইবে, এখন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর নহে. এখন কলিযুগ, এখন পূর্ব্বের ন্যায় সেরূপ সাধু নাই, এখন সকলেই পাপী অসাধু, এ সকল পাপী অসাধুদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য, হরি, তোমাকে ইহাদিগের নিকট প্রকাশিত হইতে হইবে। এবার হরি তোমার অনন্ত করুণারূপ মহাসাগরকে উথলিত হইতে বল ” হরি বলিলেন হরিকে “হে হরি, তুমি অন্যান্য যুগে সাধুসখা নাম লইয়াছিলে, এবার কাঙ্গাল-সখা, দীনসখা, পাপীর বন্ধু নাম লইয়া পৃথিবীতে যাও, সমুদয় সাধুদিগকে একত্র করিয়া নববিধান লইয়া পতিত জগৎকে উদ্ধার কর।” অন্যান্য যুগে পবিত্রাত্মা সাধুগণ বহু তপস্যা এবং সাধনের পর ঈশ্বরদর্শন লাভ এবং ঈশ্বরবাণী শ্রবণ করিতেন, বর্ত্তমান যুগে দীন কাঙ্গাল মলিন আত্মা সকল ঈশ্বর দর্শন এবং প্রত্যাদেশ লাভ করিতেছে। এই নববিধানে তোমার আমার সৌভাগ্য, এবার কেবল ঈশা চৈতন্যের সৌভাগ্য নহে, এবার তোমার আমার মত পাপীর চক্ষু সেই নিরাকার অতীন্দ্রিয় পূর্ণানন্দ পুরুষকে দেখিবে। এবার পাপীর দুঃখীর দেহ মধ্যে কাঙ্গালের ঠাকুর আসিবেন। ঈশা গৌরাঙ্গ হরিপ্রেমে মজেন ইহা বড়, না তোমার আমার মত জগাই মাধাই স্বর্গ লাভ করিল ইহা বড়? তোমার মলিন চক্ষু আর আমার পাপ নয়ন যদি মার মূর্ত্তি দেখে ইহা কি ঈশ্বরের সামান্য দয়া? এই নববিধানে কাঙ্গালেরা মাকে দেখিতে পাইবে এই জন্যই কাঙ্গালদিগের এত আনন্দ। এবার সকলেই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে। এবার ঈশ্বর পাপী পুণ্যাত্মা সকলকেই দেখা দিবেন। এই নূতন বিধানের প্রভাবে যাহার দেহ মন ভগ্ন সেও পরব্রহ্মের চরণ ধরিয়া প্রণাম করিবে। এই সংবাদ অতি উচ্চ এবং গভীর সংবাদ এবং পাপী জগতের পক্ষে ইহা অতি আনন্দের সমাচার। স্বর্গের সেই প্রত্যাদেশ যাহা ঈশা মুসার কাণে প্রবেশ করিত, সেই প্রত্যাদেশ তোমার আমার মত পাপীর কাণে প্রবেশ করিবে। নারদ গৌরাঙ্গ প্রভৃতি যে হরিপ্রেমামৃত পান করিতেন তোমার আমার বিষয়কলুষিত হৃদয় সেই সুধারস আস্বাদন করিবে। করুণানিধান ঈশ্বর এবার পাপীদিগকে তাঁহার বিধানভুক্ত করিলেন। তোমার আমার মত দশ জন, এক শত জন, সহস্র জন এই নববিধানভুক্ত হইবে, এই

নববিধান কাহাকেও পরিত্যাগ করিবে না। ইহা পরলোকস্থ এবং এই পৃথিবীর সমুদয় সাধুদিগকে একীভূত করিবে এবং অসাধুদিগের উদ্ধারের উপায় করিবে। এই নববিধান পরলোকগত সমুদায় সাধুদিগের ভাব সমষ্টি করিয়া প্রত্যেক বিধানবাদীর অন্তরে সন্নিবিষ্ট করিবে। কোন্ ভাবুকের না ইচ্ছা হয় যে আবার প্রাণের গৌরাঙ্গ, নারদ, জনক, শুকদেব প্রভৃতি ফিরিয়া আসিয়া আমাদিগের মধ্যে হরিলীলা প্রকাশ করেন? হে ভাবুক ব্রাহ্ম, আজ এই উৎসবে যদি তুমি সেই প্রাচীন সাধু ভক্তদিগকে দেখিতে পাও, তোমার কত আহ্লাদ হয়। হে সঙ্গীত-রসজ্ঞ ব্রাহ্ম, আজ যদি তুমি বীণা ছাড়, আর তোমার প্রাণের ভিতরে নারদ আসিয়া বীণা বাজান অদ্যকার ব্রহ্মোৎসব কেমন সুখের ব্রহ্মোৎসব হয়। হে যোগী ব্রাহ্ম, আজ যদি তোমার মলিন জিহ্বাতে, তুমি "ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক" এই কথা না বল; কিন্তু ঈশা তোমার আত্মার মধ্যে প্রবেশ করিয়া "হে স্বর্গস্থ প্রভু, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক," এই কথা বলেন, তাহা হইলে অদ্যকার উৎসব মহাযোগের উৎসব হয়। হে ভক্ত ব্রাহ্ম, আজ যদি তোমার নিজের হৃদয়ের ভক্তিরসে প্রমত্ত হইয়া তুমি হরিসংকীর্ত্তন না কর, এবং মৃদঙ্গ না বাজাও, কিন্তু তোমার হৃদয়ের মধ্যে গৌরাঙ্গ আসিয়া হরিগুণ গান করেন এবং মৃদঙ্গ বাজান তাহা হইলে অদ্যকার উৎসব স্বর্গীয় ভক্তি প্রমত্ততার উৎসব হয়। হে ধ্যানার্থী ব্রাহ্মগণ, আজ যদি তোমরা আপনারা নিজের চেষ্টায় ব্রহ্মধ্যান না কর, কিন্তু প্রাচীন যোগী ঋষিগণ তোমাদিগের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যোগ ধ্যান করেন তাহা হইলে আজ এখানে ইহলোক পরলোক এক হইবে। সাধুভক্তগণ আজ আমাদিগের এই মন্দিরে আসিলে আমাদিগের মনে কত সুখ শান্তি সঞ্চারিত হইবে। আমাদিগের ঘরে আসিয়া আজ যদি তাঁহারা নাচেন আমাদিগের কত আহ্লাদ হয়। হে ঈশ্বরের ভক্তগণ, যদি তোমরা এই ধরাধামে আসিতে, প্রাণের রক্ত দিয়া তোমাদিগের চরণ প্রক্ষালন করিয়া দিতাম, এবং তোমাদিগের চরণতলে মস্তক প্রণত করিতাম। হে ভক্তগণ, আর কি তোমরা ধরাধামে ফিরিয়া আসিবে না? ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদ, আর কি তুমি এখানে আসিয়া বীণা বাজাইতে বাজাইতে হরিগুণ গান করিবে

না? গৌরাঙ্গ, আবার কি তুমি ধরাতলে আসিয়া হরিভক্তির প্রমত্ততা দেখাইবে না? কলিযুগে কি সাধুদিগের পুনরাগমন হইবে না? পাপীদি-গের ভাগ্যে ভক্তচন্দ্রোদয় হবে কেন? যে ঈশাকে দুষ্ট পৃথিবী নির্যাতন করিয়া ক্রুশে বধ করিল, সেই ঈশা কি আবার এই পৃথিবীতে প্রত্যাগমন করিবেন? জীবের নানা প্রকার শোক তাপে তাপিত প্রাণকে শান্তি দিবেন বলিয়া যাঁহারা আসিয়াছিলেন আর কি সেই সাধু যোগী মহাপুরুষেরা আসিবেন না? হে সাধু যোগী ঋষিগণ, হে ভক্তগণ, তোমরা কোথায় গেলে? কোথায় রহিলে, হে হরিভক্ত গৌরাঙ্গ, আর কি তুমি এই ধরাতলে আসিয়া কুষ্ঠরোগাক্রান্ত পাপীকে ক্রোড় দিবে না? আর কি তুমি শত্রু মিত্র সকলকে প্রেম বিলাইবে না? মহর্ষি ঈশা, আর কি তুমি পাহাড়ে দাঁড়াইয়া শিষ্যদিগকে সঙ্গে লইয়া উপদেশ দিবে না? পৃথিবী, দুর্ভাগা পৃথিবী, একে একে সকল সাধু তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। সাধুদিগকে তুমি অপমান এবং নির্যাতন করিয়া পরলোকে পাঠাইয়া দিলে। যদি সাধুদিগকেই তুমি তোমার বক্ষের মধ্যে না রাখিতে পারিলে তবে তোমার মধ্যে এখন আর কি দেখিব? কার মুখের পানে তাকাইব? হে নববিধান, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি দয়া করিয়া এই পতিত জগৎকে উদ্ধার করিবার জন্য আবার সমুদয় সাধু সাধ্বীদিগকে সঙ্গে লইয়া এস। তুমি কোন এক জন সাধুকে সঙ্গে লইয়া আসিলে না, কিন্তু তুমি পৃথিবীর সমুদয় সাধুদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিলে। হে নববিধান, অন্যান্য বিধানরূপ তোমার ভগ্নীরা স্বর্গের পরীর ন্যায় বহু অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে ধরাতলে অবতরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা এক এক জন সাধুকে মস্তকে লইয়া আসিয়াছিলেন, তুমি এক জনকেও পরিত্যাগ করিলেন না। হে নববিধান, তুমি তাঁহাদের সকলকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছ তুমি এক জনকেও পরিত্যাগ করিলে না। হে নববিধান, তুমি কেন একজনের সঙ্গে আসিলেন না? তুমি কেন সকলকে সঙ্গে লইয়া আসিলে? মা, বিশ্বজননি, তুমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে এক একজন সাধুকে পৃথিবীর আদর্শ করিয়া পাঠাইয়াছিলে, এবার কেন সমুদয় সাধুদিগকে একত্র করিয়া নববিধান পাঠাইলে? হে

নববিধান, তোমার অমুক ভগ্নী বিধান বহুমূল্য লাল রঙ্গের রত্ন লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, তোমার আর এক ভগ্নীবিধান অমূল্য নীলমণি মস্তকে করিয়া আসিয়াছিলেন এবং তোমার প্রত্যেক ভগ্নী বিধানই এক একটি বহুমূল্য রত্ন লইয়া আসিয়াছিলেন, তুমি কি লইয়া আসিয়াছ? তুমি সেই সমুদয় রত্নগুলির মালা গাঁথিয়া রত্নহার লইয়া আসিয়াছ। তোমার মা স্বর্গের জননী বলিলেন "আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে আমার এক একটি সাধু পুত্রকে প্রেরণ করিয়া পতিত পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছি, সেই এক একটি সাধুকে অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বকার লোকেরা ধর্ম্ম সাধন করিত, এবার কাঙ্গালসখা, দীনবন্ধু নাম লইয়া প্রত্যেক কাঙ্গালকে আমি সাক্ষাৎ দেখা দিব, এবার আমি কেবল সাধুহৃদয়ে লীলা বিহার করিব তাহা নহে; কিন্তু এবার আমি আমার জন্য ব্যাকুল ও কাঙ্গাল প্রত্যেক পাপীকেও দেখা দিব। প্রত্যেক কাঙ্গাল এবার কাঙ্গালসখাকে স্বচক্ষে দেখিবে, এবার আমি আমার সমস্ত সাধুদিগকে সঙ্গে লইয়া আমার দীন সন্তানদিগের গৃহে গৃহে অবতরণ করিব। এবার মধ্যবর্ত্তীর প্রয়োজন হইবে না, এবার সাধু অসাধু যে কেহ আমার জন্য ব্যাকুল হইবে সে আমার প্রত্যক্ষ দর্শন পাইবে।" বাস্তবিক দীনজননীর বিশেষ কৃপায় কাঙ্গাল দীনদুঃখী পাপী সকলেরই মনে আশা এবং আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে। এখন অতি সহজেই দুঃখী পাপীরা ভক্তবৎসল পরিত্রাতার দর্শন পায়। আগেকার যোগী বহু যোগ তপস্যা ও সাধনের পর যোগেশ্বরের দর্শন লাভ করিতেন। আগেকার যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি যোগিগণ বহু সাধনের পর ইষ্টসিদ্ধি লাভ করিতেন; কিন্তু এখন এক বার বিশ্বাস ও ভক্তির সহিত ডাকিলেই অনুতপ্ত পাপীও ব্রহ্মদর্শন লাভ করে। পূর্ব্বে ভক্তির অবতার পরমভক্ত শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তিরসে মত্ত হইয়া যেরূপ নৃত্য করিতেন এখন তোমার আমার মত জগাই মাধাইও সেইরূপ নৃত্য করিবে। গরিব কাঙ্গালেরা এবার প্রত্যক্ষ ভাবে ঈশ্বরদর্শন লাভ এবং ঈশ্বরবাণী শ্রবণ করিবে, এই বিষয়ে আগেকার অপরাপর ধর্ম্মবিধান অপেক্ষা বর্ত্তমান বিধানের গৌরব অধিক। নববিধানের এই গৌরবের কথা শুনিয়া এই উৎসবমন্দিরে আজ নানাদেশ হইতে দুঃখী পাপী কাণা খোঁড়া সকল আসিয়া জুটিয়াছে এবারকার বিধানে কাঙ্গালেরা মহা উল্লাস প্রকাশ করিবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে

অনেক কঠোর তপস্যা বলে ইন্দ্রিয়াদি দমন করিয়া শতাব্দি বৎসর পরে সাধকেরা ব্রহ্মদর্শন লাভ করিতেন, এখন পাপীদিগের জন্য আনন্দের বাজার বসেছে। আজ হরি দুঃখী কাঙ্গালের বন্ধু হইয়া পৃথিবীতে প্রকাশিত হইতেছেন। সেই প্রাচীন কালের যোগেশ্বর আজ সখ্যভাবের ধর্ম্ম প্রকাশ করিতেছন। যদিও তিনি ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী তথাপি তিনি পাপীর বন্ধু হইয়াছেন। আজ বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর দেখা হইতেছে। হে বন্ধু, এত দিন কোথায় ছিলে? তুমি স্বর্গস্থ ভগবানের বন্ধু তাহা কি তুমি জান? ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী তোমার বন্ধু তুমি এমন কাঙ্গাল হইয়াছ কেন? হরির সন্তান দুঃখী কাঙ্গাল হইবে ইহা কি হরির প্রাণে সহ্য হয়? হরি বলিলেন, "আমি গগনে রাখিলাম সোণার চাঁদ, আর ভূতলে রাখিলাম আমার সন্তান চাঁদ। আমার দুই চাঁদই হাসিতেছে।" জগজ্জননী আপনি হাসিলেন, এবং তাঁহার চাঁদ দুইটিকেও হাসালেন। মানুষ সন্তানকে দেখে ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী হাসিলেন। পৃথিবীর কাল মাটীর উপরে যেন সোণার পুতুল হামাগুড়ি দিতেছে। ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীর প্রত্যেক ছেলে ঠিক্ যেন এক একটি চাঁদ। যে মসলাতে ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী আকাশের চাঁদ সৃজন করিয়াছেন, সেই মসলাতেই তিনি মনুষ্যশিশু সৃজন করিয়াছেন। হরি আকাশের নির্দ্দোষ চন্দ্রকে বলিলেন "চন্দ্র তুমি আমার বন্ধু," তিনি ভূতলের চন্দ্র মনুষ্যশিশুকে বলিলেন "হে মনুষ্যশিশু, তুমিও আমার বন্ধু, তোমার ভাগবতী তনু আমার প্রেমে, হরিপ্রেমে গঠিত। গৌরাঙ্গ তুমি, পৃথিবীতে গিয়া প্রেম প্রচার কর।" হরি আপনার স্বভাবের ভিতর থেকে জ্যোতি লইয়া, তেজ লইয়া, সোণা লইয়া জীবাত্মা গঠন করিলেন। ভগবান্ আপনার স্বরূপ দিয়া মনুষ্যশিশু সৃজন করিলেন। তিনি পুণ্য, প্রেম এবং নিরাকার চিন্ময় পদার্থ দিয়া জীবাত্মা গঠন করিলেন। তোমার আমার ভিতরে ঈশ্বর সখারূপে বাস করিতেছেন। হরি সাধুদিগেরও সখা আমাদিগেরও সখা। ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী পৃথিবীতে আসিয়া মলিন মানবের সখা হইয়াছেন। তিনি আমাদিগকে ভাল বাসেন, আমরাও তাঁহাকে ভাল বাসিব। ছেলেইত যথার্থ বন্ধু, ছেলের মত অমন বন্ধু আর কোথায় আছে? কলিকালে সখ্যমুক্তি। কলিকালে মনুষ্যশিশু ভগবান্‌কে সখা বলিবে। কলিকালে যেমন একদিকে নানা প্রকার ভ্রম, কুসংস্কার এবং

পাপের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, তেমনি অন্য দিকে ঈশ্বরের করুণা গভীরতর এবং ঘনতর হইয়া নববিধানরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। কলিযুগে যেমন এক দিকে কোন এক জন অবতার অথবা একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ পাইলাম না তেমনি নববিধান পাইয়া সকল ক্ষতি পূরণ হইল। বিধাতা এবারও আমাদিগকে কোন এক জন গুরু কিংবা কোন একখানি শাস্ত্র দিলেন না; কিন্তু তিনি আপনাকে দান করিয়া এবার গরিব কাঙ্গালদিগের সকল অভাব মোচন করিলেন। এবার স্বর্গের জননী আমাদিগের মাকে পাইয়া আমাদিগের সকল দুঃখ দূর হইল। কোন এক জন গুরু কিংবা কোন একখানি বিশেষ ধর্ম্মশাস্ত্র অবলম্বন করিতে না পারিয়া যখন নিরুপায় পৃথিবী কাঁদিয়া বলিল "হে ঈশ্বর, হে ভগবান্, এবার আমার কি গতি হইবে?" পৃথিবীর এই আর্ত্তনাদ শুনিয়া ভগবান্, "আমি গুরু, আমি বিধি, আমি জীবের সর্ব্বস্ব, আমি পাপীর সখা, আমি জীবকে সাক্ষাৎ ভাবে দেখা দিব, আমি জীবের সঙ্গে সাক্ষাৎ ভাবে কথা বলিব" এই সকল কথা বলিয়া এই নববিধান প্রেরণ করিলেন। হে ব্রাহ্মবন্ধু, তোমার আমার এই কলঙ্কিত তনুর মধ্যে ব্রহ্ম সখা হইয়া আছেন। এবার বিশ্বজননী তাঁহার প্রত্যেক ভক্তের ঘরে লক্ষ্মী হইয়া সমুদায় কার্য্য করিবেন। এবার কোটি কোটি লক্ষ্মীর আবির্ভাব আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিবে। এবার ভুবনমোহিনী জগজ্জননী তাঁহার আশ্চর্য্য পালনী শক্তি দেখাইয়া আমাদের সকলকে মোহিত করিবেন। এবার ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীর সখ্যভাবে আমরা একেবারে মুগ্ধ হইয়াছি। আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি পাপীর বন্ধু বিশ্বেশ্বর পাপী বন্ধুকে খাওয়াইতেছেন, পরাইতেছেন, আদর করিতেছেন। বন্ধুগণ, যিনি তোমাদিগের অত্যন্ত নিকটে অন্তরতম সখা হইয়া তোমাদিগের প্রাণের মধ্যে এবং প্রতি ঘরে বাস করিতেছেন, তাঁহাকে ব্রহ্মমন্দিরে সপ্তাহান্তে, কি বৎসরান্তে এক দিন ভগবান্ ভগবান্ বলিয়া ডাকিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত হইবে? এবার যে হরি বলিতেছেন, "আমি আমার ভক্তের সঙ্গে এক হব, এবার আমার খাস দরবারে আমি আমার নববিধানভুক্ত ভক্তদিগকে দেখা দিব, এবং যাহারা আমাকে দেখিবে তাহারা আমার মধ্যে আমার বুকের ধন শ্রীচৈতন্য, ঈশা, শাক্য প্রভৃতিকেও দেখিতে পাইবে।" এই নববিধানে যোগ, ভক্তি, সেবা, জ্ঞান, বৈরাগ্য

সমুদয় ভাবের সামঞ্জস্য হইবে। এই বিধানে ঈশ্বর স্বয়ং যোগেশ্বর, ভক্তবৎসল, প্রভু, শাস্তী, গুরু ও পরম বৈরাগী প্রভৃতি সমুদয় স্বরূপ একত্র করিয়া প্রকাশিত হইয়াছেন। ঈশ্বর নিজে এবার আমাদিগের শাস্ত্র, মন্ত্র, বেদ, বিধি, বিধাতা, সখা সমস্ত। সখা সকল দুঃখ নাশ করেন। আদ্যাশক্তি ভগবতী এবার সর্ব্বদুঃখবিনাশিনী লক্ষ্মীরূপে তাঁহার প্রত্যেক ভক্তের ঘরে অবতীর্ণা হইয়াছেন। স্বর্গের জননী মা লক্ষ্মী তাঁহার ভক্তের গৃহে পরিচারিকা হইয়াছেন। আমি বলি ক্ষুধার সময় আমাকে ভাত দিবে কে? মা লক্ষ্মী বলেন আমি যে অন্নপূর্ণা। যখন আমি বলি আমি যে মূর্খ, আমাকে জ্ঞান দিবে কে? তখন ভগবতী বলেন, আমি যে জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী। যখন আমি বলিলাম আমাকে যোগ শিখাইবে কে? "কেমনে হব যোগী?" মা যোগেশ্বরী বলিলেন, আমার কাছে বস, আমি তোমাকে যোগ শিখাইব। আমার বুকের ভিতরে যাজ্ঞবল্ক্য, শাক্য প্রভৃতি বাস করিতেছে। আমি যখন বলিলাম শ্রীগৌরাঙ্গের মত ভক্ত হইব কিরূপে? মা বলিলেন, আমার কাছে বস, আমার বুকের ভিতরে শ্রীচৈতন্য জীবিত রহিয়াছে, আমি তোমায় প্রাণ ভরিয়া ভক্তিসুধা খাওয়াইব। মা, কলিযুগে হল কি? প্রথমেই বলিয়াছিলাম, ব্রাহ্মধর্ম্মে গুরু নাই, শাস্ত্র নাই, অভিভাবক নাই, এখন মা, বলিতেছি ঐ সকল কথা বলিয়া অপরাধ করিয়াছি। কেন না মা, জগজ্জননী, এখন আমরা দেখিতেছি তুমি আমাদের গুরু, তুমি আমাদের শাস্ত্র, তুমি আমাদের অভিভাবক, এবং তুমি আমাদের সমস্ত অভাব মোচন করিতেছ। তুমি কেবল মা নও, কিন্তু জীবের বন্ধু হইয়া তাহার সকল দুঃখ মোচন করিতেছ। এই নববিধানে কোন মানুষ পথপ্রদর্শক নহে, কোন নরোত্তম সাধু নাই,এই বিধানে জগজ্জননীই সর্ব্বস্ব। যত ক্ষণ না মা হাত তুলে একটি সত্য দেন, তত ক্ষণ কেহই একটি সত্য পাইতে পারে না। যখন ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী মার সঙ্গে জীবের এরূপ অব্যবহিত নিটক সম্বন্ধ, তখন এই নববিধান দিগ্বিজয়ী হইবেই হইবে। প্রচীন কালের এক এক বিধানবাগানে এক এক ফুল ফুটিত, এই নববিধান বাগানে সকল ফুল ফুটিয়াছে। বিচিত্রস্বরূপ ঈশ্বর এই বিচিত্র উদ্যানের ভিতরে বসিয়া হাসিতেছেন। এই নববিধানের লোকেরা প্রাচীন সমুদয় বিধানের উত্তরাধিকারী। এই বিধান শাক্য, যাজ্ঞবল্ক্য, ঈশা,

মুসা, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি সমুদয় প্রেরিত সাধুদিগের বিধান। যখন মা আমাদের বন্ধু হইলেন, তাঁহার সঙ্গে আমরা তাঁহার সমুদয় ভক্ত সন্তান-দিগকেও পাইলাম। এই ব্রহ্মমন্দিরে নববিধানের ঘোরতর মহাযোগ স্থাপিত হইল। আজ শাক্যের মা, মৈত্রেয়ীর মা, ঈশার মা, মহম্মদের মা, শ্রীগৌরাঙ্গের মাকে আমরা মা বলিয়া ডাকিলাম। মা বলিলেন;—"বৎসগণ তোমরা ধন্য যে তোমরা আজ আমাকে মা বলিয়া ডাকিলে; কিন্তু তোমাদের মধ্যে একটি বুঝিবার অবশিষ্ট রহিয়াছে। তোমরা কি জান না তনয় আর মা এক। আমা হইতে বুকের ধন তোমরা বাহির হইয়াছিলে; আবার কেন তোমরা আমার সঙ্গে এক হইয়া যাও না? আবার কেন অনন্ত চিন্ময়ীর ভিতরে ক্ষুদ্র চিৎ প্রবেশ করুক না? সন্তানগণ এবার তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্মা বিসর্জ্জন দিয়া, আমিত্ববিহীন হইয়া আমার সঙ্গে মহাযোগ সাধন না করিলে, এবারকার নববিধান পূর্ণ হইবে না এবং তোমরাও সুখী হইতে পারিবে না।" বাস্তবিক এবার মার সঙ্গে অভিন্ন না হইলে মার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না। সখ্যমুক্তি ভিন্ন এবার জীবের গতি ও শান্তি নাই। পূর্ব্বকার যোগী ঋষিগণ বলিতেন, "পরমাত্মা জীবাত্মেতে অভেদ," "আমি এবং আমার পিতা এক।" প্রাচীন সাধুরা এ সকল কথা কত প্রকারে বলিয়া গিয়াছেন। আমরা নববিধানবাদী, আমরা প্রচীন অদ্বৈতবাদ মানি না; কিন্তু আমাদিগের বিশুদ্ধ দ্বৈতবাদের মধ্যেও অভেদবাদ রহি-য়াছে। ছেলে তাহার মাকে মা বলিয়া ডাকে; কিন্তু তাহাতে মার সমুদয় খেদ মিটে না। মা অস্থির হইয়া বলিতেছেন, "আমার বাছাধন, কাছে এস, আমার প্রাণের ভিতর এস, এস হৃদয়ের রত্ন তোমাকে প্রাণসিন্ধু-কের ভিতরে রাখি।" যোগ কি কঠোর তপস্যা? না। মার সঙ্গে তনয়ের যোগ সুধাময় যোগ। মা, আমার তোমার কোলের উপযুক্ত নহি, কাল ছেলে মার কোলে বসিবে? চিরকাল যুগে যুগে সাধুজননী নাম লইয়া তুমি সাধুদিগকে কোলে করিয়াছ। এবার কলিযুগে পাপে কলঙ্কিত যত কাল ছেলেদের কি তুমি কোলে করিবে? তোমার কি, মা, ঘৃণা নাই? মার স্নেহ বুঝা গিয়াছে। গৌরাঙ্গ ভিন্ন আর কেহ মার কাছে যাইতে পারে না। ছিছি মা, তুমি যদি কাল ছেলেকে সত্য সত্যই ঘৃণা

কর তবে যে দয়াময়ি তোমার মা নাম, ডুবিবে। কিন্তু মা, তুমি কাল ছেলেকে ঘৃণা করিতে পার না। তুমি বলিতেছ;—"আমার এক অঙ্গে গৌরাঙ্গ, আর এক অঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গ। গৌরাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, সাধু অসাধু উভয়ের প্রতি আমার দয়া সমান থাকে। মার কাছে পূর্ণাঙ্গ যেমন অপূর্ণাঙ্গও তেমন। বড় বড় ঋষির প্রতি যেমন তাঁহার দয়া, জগাই মাধাইয়ের প্রতিও ঠিক তাঁহার সেইরূপ ষোল আনা দয়া। মা ভুবনমোহিনী তাঁহার এক দিকে সাদা ভক্ত ছেলে, আর এক দিকে পাষণ্ড কাল ছেলেকে নিয়ে দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার এক দিকে সমুদয় সাধু এবং অন্য দিকে সমস্ত অসাধু। এবার এই নববিধানে মা বলিলেন; "আমি আমার সন্তানদিগের সঙ্গে এক হইব।" মার ইঙ্গিতে সাধু আস্তে আস্তে মার বুকের ভিতরে পলায়ন করিল। কেন সাধুর তিরোভাব হইল? ভাল ছেলে মার বুকের ভিতরে চলে গেল. ইহা দেখে কাল ছেলে কেঁদে উঠিল। কাল ছেলে বলিল "আমার সুন্দর ভাই কোথায় গেলেন, বুঝি আমায় কাল দেখে পালাইয়া গেলেন, তিনি বুঝি রাগ করে পালাইয়া গেলেন।" প্রাচীন বিধানের সুন্দর মহাপুরুষেরা বুঝি নববিধানের কাল পাপীদিগের সঙ্গে থাকিবেন না। মহাজনেরা কি হাড়ী বাগ্‌দী মুদ্দ-ফরাস প্রভৃতি ছোট লোকের সঙ্গে নাচিবেন? পুরাতনে নববিধানে মিলিবে না। সাধু মহাজনেরা স্বর্গে মার বুকের মধ্যে লুকাইলেন, কৃষ্ণবর্ণ অবাধ্য ছেলেরা বাহিরে পড়িয়া রহিল। দুঃখী পাপীরা বলিল, ঈশ্বরের এক শত আট নাম প্রচার হইল, নানা প্রকার ধর্ম্মবিধান প্রবর্ত্তিত হইল; কিন্তু পাপীদিগের দুঃখ ঘুচিল না; পৃথিবীর দুঃখী কাঙ্গালেরা স্বর্গলাভ করিতে পারিল না। আমাদের ভাই শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি স্বর্গে চলিয়া গেলেন; কিন্তু আমরা পড়িয়া রহিলাম, আমরা যোগধামে, প্রেমধামে যাইতে পারিলাম না। দুঃখী সন্তানের দুঃখ দেখিয়া মা বলিলেন;—"বৎস, তুমি তোমার সাধু ভাইকে চেন নাই, তুমি যাহা মনে করিয়াছ তাহা নহে, তোমার ভাই কেন আমার বুকের ভিতরে চলিয়া গেলেন তাহা তুমি বুঝিতে পার নাই। তোমার ভাই তোমাকে পথ দেখাইবার জন্য আগে আমার প্রাণের ভিতরে চলিয়া গিয়াছেন, প্রজ্ঞা তোমার মধ্যে প্রবেশ করিলে

তুমি ইহা বুঝিতে পারিবে। তোমার ভক্ত ভাই আমার কোলে উঠিলেন তাই তুমি আমার কোলে উঠিতে সাহস করিতেছ। উনি একেবারে আমার প্রেমসাগরে ডুবিলেন, তাই তুমিও ডুবিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছ।" মার মুখে এ সকল সুধাময় কথা শুনিয়া দুঃখীর মনে সান্ত্বনা হইল। সত্যের জননী মা কেবল কি দুঃখীকে প্রবোধ দিবার জন্য এ সকল কথা বলিলেন? আদ্যাশক্তি মহাসতী কোন কারণেই মিথ্যা বলিতে পারেন না, প্রবঞ্চনা করিতে পারেন না। বাস্তবিক জগজ্জননী ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী সাধু অসাধু সকলে-রই সখা। দুঃখী ভাই, তুমি কি মনে কর, তুমি পাপ করিয়াছ বলিয়া মার সঙ্গে যোগী হইতে পারিবে না? ভাই, তুমি যাহাই কেন হও না তুমি যে মার নাড়ীর সঙ্গে বাঁধা। মার সঙ্গে সন্তানের বিচ্ছেদ হয় না। মার সঙ্গে সাধু অসাধু সকলেরই প্রাণের নিগূঢ় যোগ রহিয়াছে। মার সঙ্গে কে না যোগী হইতে পারে? মা তাঁহার সাধু অসাধু সকল সন্তানকেই তাঁহার সঙ্গে যোগ স্থাপন করিতে ডাকিতেছেন। বন্ধুগণ, তোমরা নববি-ধানে চিহ্নিত হইয়া সর্ব্বত্র এই যোগের কথা বিস্তার কর। ঈশ্বর পাপীর বন্ধু হইয়াছেন, আর জীবের ভয় কি? মার সঙ্গে যোগ করিলে আর পাপ করিবার ইচ্ছা থাকিবে না, পাপের তনু একেবারে চলিয়া যাইবে। জগজ্জননীর প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবাত্মা পরমাত্মার সমুদয় ভেদা-ভেদ চলিয়া গেল। নববিধানে জীব এবার মার যোগ করিয়া আমিত্ব-বিহীন হইল। অভেদ ধর্ম্ম, অভেদ বিধান। ধন্য নববিধান তুমি! তুমি সমস্ত বিধানকে এক বিধান করিলে, সমস্ত বিধিকে এক বিধি করিলে, এবং সেই এক জীবকে জীবেশ্বরের সঙ্গে এক করিয়া দিলে। নববিধান, তোমার প্রসাদে আমরা এক বিচিত্র প্রমোদ কাননে বসে আছি, তোমার নিকট অমূল্য রহস্য শিখিয়াছি। এখন দেখিতেছি ঈশ্বর ছাড়া জীব নাই, পৃথিবী নাই। জগদ্বন্ধু জগৎময়। প্রাণের বন্ধু বিশ্বেশ্বর এবার জীবকে সখ্য মুক্তি দিবার জন্য সখ্যবিধি প্রচার করিলেন। এস বঙ্গ দেশ, এস ভারত, এস সমস্ত জগৎ, তোমরা সকলে এই সখ্যমুক্তি গ্রহণ কর। কি সুন্দর বিধান প্রচারিত হইল। ঈশ্বরবিরুদ্ধ সমুদয় বিরোধ ও অসদ্ভাব উড়িয়া গেল। কোন বিরোধ নাই, তুমি আমি নাই, সকলের আমিত্ব

ডুবিল জগতে, জগৎ ডুবিল মার ভিতরে। আজ মার বক্ষসমুদ্রে আমরা সকলে মৎস্যের মত ক্রীড়া করিতেছি। মার পুণ্য জলে, স্নেহ জলে আজ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড মগ্ন হইল। মার ক্রোড়ে ইহলোক পরলোক এক হইল সিন্ধুদেশ, ব্রহ্মদেশ, বম্বে, মান্দ্রাজ এক হয়ে গেল। দেশে দেশে দ্বেষ রহিল না। ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিবাদ রহিল না, সকলে এক জলে মগ্ন হইয়া গেল। জগজ্জননী সত্যের জল, জ্ঞানের জল, প্রেমের জল, পুণ্যের জল, শান্তির জল হইয়া সকলকে বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন। জীবের প্রতি মার কত ভালবাসা, কত সখ্য, কত বন্ধুতা! এক মা, এক বিধান, আবার মার সন্তানও এক। নববিধান, প্রিয় নববিধান, কি শোভা দেখাইলেন।, সুন্দর ছবি! জগন্মোহিনী মা, সকল দুঃখ নিরানন্দ চলিয়া গেল, কেবল ভক্তদিগের প্রাণের মধ্যে, তোমার সন্তানদিগের প্রাণের মধ্যে তোমারই প্রেমানন্দ রহিল।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নববিধানের বিজয় নিশান।

এক পঞ্চাশত্তম সাংবৎসরিক ব্রহ্মোৎসব, রবিবার রাত্রি।

১১ মাঘ, ১৮০২ শক।

নববিধানের অভ্যুদয়ে সকল জগৎ প্রেমে ভাসিল। নববিধানের প্রেমিক জন সকল প্রেমে প্রেমিক হইল। নববিধানের জ্ঞানী জন সকল জ্ঞানে জ্ঞানী হইল। নববিধানের পুণ্যাত্মা সকল পুণ্যে পুণ্যবান্ হইল। নববিধানের যোগী সকল যোগে যোগী হইল। নববিধানের প্রভাবে সকল দেশ এক দেশ হইল, দূর নিকট হইল। পৃথিবীর সকল বিধানের প্রেম ভক্তি অনুরাগ, যোগ, জ্ঞান, সমাধি, উৎসাহ, মত্ততা আমাদিগের এই প্রিয়তম নববিধানের ভিতরে প্রবেশ করিল। এই নববিধানে ঈশার সঙ্গে শ্রীচৈতন্যর দেখা হইল। ঈশা বলিলেন, "গৌরাঙ্গ ভাই, তুমি তোমার ভক্তিবিধান পূর্ণ করিবার জন্য চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গ দেশে নবদ্বীপ নগরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে, আমি আমার মহাপ্রভুর বিধান পূর্ণ করিবার জন্য আঠার শত বৎসর পূর্ব্বে পেলেষ্টাইন দেশের

জেরুজেলাম নগরে জন্মিয়াছিলাম। কিন্তু আজ পৃথিবী হইতে এক নূতন সংবাদ আসিয়াছে। আজ শুনিতেছি, বঙ্গদেশে কলিকাতা নগরে, ভাই গৌরাঙ্গ, তোমার ভক্তির নিশান এবং আমার আনুগত্যের নিশান একত্র সিলাই করিয়া নববিধান বাদীরা আকাশে উড়াইয়া দিয়াছে। আজ নাকি কতকগুলি দুর্ব্বলহৃদয় বাঙ্গালী সন্তান তোমার নাম ও আমার নাম একত্র উচ্চারণ করিতেছে।" আবার গৌরাঙ্গ প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে ঈশাকে বলিতেছেন;—"ভাই ঈশা, তুমি যে পৃথিবীকে বলিয়া আসিয়াছিলে;—'প্রভু, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হউক।' তোমার সেই বিবেকের ধর্ম্ম, আর আমার হরিনামের রোলের প্রমত্ততার ধর্ম্ম একত্র হইয়া নববিধান নাম ধারণ করিয়াছে। ঈশা ভাই, পৃথিবীতে কি হইল। ঈশ্বরের আদেশে দুই ধর্ম্ম এক ধর্ম্ম হইল, দুই রস একত্র হইল।" ঈশা গৌরাঙ্গকে বলিতেছেন, "গৌরাঙ্গ ভাই, নববিধানবাদীদিগের বুকের ভিতরে তুমিও আছ, আমিও আছি। ভাই, তুমি কি টান বুঝিতে পারিতেছ না? নববিধানবাদীরা আমাদের দুই জনকেই টানিতেছে। পৃথিবী এত দিন পরে তোমার আমার মধ্যে যে গূঢ় যোগ আছে তাহা বুঝিতে পারিয়াছে, নববিধান তোমার ধর্ম্মের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখিতে পাইয়াছে, আর পৃথিবী স্বতন্ত্র ভাবে আমাদিগের বিধান গ্রহণ করিবে না। এখন পৃথিবী তোমার আমার উভয় ধর্ম্ম একত্র করিয়া গ্রহণ করিবে। মুষা, মহম্মদ, শাক্য, যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি আমি প্রভৃতি যতগুলি ভাই স্বর্গে বসে আছি, নববিধান আমাদের সমুদয়ের নিশান একত্র করিয়া পৃথিবীতে নিখাত করিবে, পৃথিবীতে মহম্মদ, মুষা, কবীর, নানক, নারদ বুদ্ধদেব প্রভৃতির দ্বারা যত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সে সমুদায় ধর্ম্ম হইতে মধু আহরণ করিয়া নববিধানবাদীরা এক নূতন মধুচক্র রচনা করিয়াছে, তাহারা প্রচুর পরিমাণে সেই নূতন মিশ্রিত সুধা পান করিয়া মহা উল্লাস ও আনন্দে নৃত্য করিতেছে। ঐ দেখ তাহাদিগের সঙ্গে উৎসবানন্দ ভোগ করিবার জন্য চট্টগ্রাম, সিন্ধু, বম্বে, মান্দ্রাজ প্রভৃতি দেশদেশান্তর হইতে লোক সকল আসিয়াছে। ঐ দেখ তাহাদিগের উৎসবমন্দিরে এই নূতন সুধা পান করিয়া সকলে কেমন উন্মত্ত হইয়াছে। ভাইগুলি মন্দিরের এক দিকে এবং ভগ্নীগুলি আর এক দিকে রহিয়াছে। চল ভাই যাই, আমারা তাহাদিগের

এই নববিধানের নিশান ধরিগে। তাহারা আমাদের সকলের নিশান একত্র করিয়া এক সংযুক্ত নিশান ধরিয়াছে, চল আমরা সকলে গিয়া সেই নিশান ধরি।" মনে হইতেছে স্বর্গের সাধুগণ আসিয়া প্রত্যেক নববিধানবাদীকে এইরূপ বলিতেছেন, "প্রাণের বৎস, সাধু, সাধু, তোমার যাহা করিবার তুমি তাহা করিলে, তোমার কার্য্য হইয়াছে, ধন্য তুমি যে তুমি পৃথিবীর সমুদয় সাধু ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও সমুদয় ধর্ম্ম গ্রন্থকে এক করিয়াছ।" সৃষ্ট আত্মা সর্ব্বব্যাপী নহে, সুতরাং পরলোকগত সাধু আত্মা সকল আমাদিগের নিকট প্রত্যক্ষভাবে আসিতে পারেন না; কিন্তু এক পবিত্র আত্মা আছে যাহার ভিতর দিয়া তাঁহারা আমাদিগের নিকট তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ পাঠাইতে পারেন। স্বর্গের জননীর আশীর্ব্বাদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগর মস্তকের উপরে তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদও আসিতেছে। তাঁহারা সকলে বিশ্বজননীর বক্ষ মধ্যে বাস করিতেছেন। ঈশা শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি সাধু ভক্তদিগের প্রাণ ঈশ্বরেতে একীভূত হইয়াছে। যখনই আমাদিগের আত্মা ঈশ্বরের পবিত্র আত্মাকে স্পর্শ করে তখনই গূঢ়ভাবে তাঁহার বক্ষস্থ সাধুমণ্ডলীর ভাবও আমাদিগের মধ্যে প্রবেশ করে। আজ মনে হইতেছে, তাঁহারা সকলে এই মন্দিরে আসিয়া আমাদিগের এই নববিধানের নিশান ধরিয়াছেন। তাঁহারা পরস্পরকে বলিতেছেন, " হায়! কি সুন্দর নিশান প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় নববিধানবাদীরা আমাদিগকে একত্র বাঁধিল!!" শ্রীগৌরাঙ্গ, মহম্মদ, ঈশা, মুষা, শাক্য, নারদ প্রভৃতি পরস্পরকে বলিতেছেন, "দেখ ভাই, পৃথিবীতে তোমার দল আমার দলকে নিন্দা করে, তোমার দলের লোকেরা আমার স্থাপিত ধর্ম্মমন্দিরে যায় না, আমার প্রচারিত ধর্ম্মগ্রন্থের আদর করে না; কিন্তু আজ দেখ নববিধানবাদীদিগের ব্রহ্মমন্দিরে কি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছে। নববিধানবাদীরা আমাদের সকলকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছে, তাহাদিগের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মমন্দিরে তুমি আমি সকলেই আছি, তাহারা তোমার আমার প্রচারিত সকল ধর্ম্মগ্রন্থেরই সমাদর করে। তাহারা কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে না, ধর্ম্মশাস্ত্রকে মিথ্যা বলিয়া উপহাস করে না, কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়কে ঘৃণা করে না। দেখ পৃথিবীতে কি সুন্দর নববিধানই প্রকাশিত হইল।" ঈশা, মুষা, শ্রীগৌরাঙ্গ, শাক্য প্রভৃতি সকলে এই নববিধানের

নিশান স্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন। যেমন কড়্ মড়্ শব্দ করিয়া এক স্থান হইতে আর এক স্থানে তাড়িতের সঞ্চার হয়, সেইরূপ কড়্ কড়্ শব্দ করিয়া ঈশা মুষা, শ্রীগৌরাঙ্গ, শাক্য প্রভৃতি আত্মা হইতে নববিধানবাদীদিগের আত্মাতে প্রত্যাদেশের জলন্ত অগ্নি আসিতেছে।" তাড়িতের ন্যায় ঈশা মুষার ধর্ম্ম আসিয়া নববিধানকে উজ্জ্বল করিতেছে। ব্রাহ্মগণ, তোমরা কি এই স্বর্গীয় তাড়িতের ধ্বনি শুনিতে পাইতেছ না? তোমাদিগের হৃদয়ে এই তাড়িতের আঘাত না লাগিলে তোমাদিগের পরিত্রাণ নাই। দেখি এই তাড়িতযোগে তোমাদের দল আঘাত পায় কি না। জগজ্জননী মা আনন্দময়ী তাঁহার সমুদয় সন্তানদিগকে লইয়া নববিধানবাদীদিগের নিকট আসিয়াছেন। এই নববিধানে মা তাঁহার প্রত্যেক সাধু সন্তানের সম্মান বাড়াইলেন। এই ভারতবর্ষে শাক্য সিংহের নাম, যোগী ঋষিদিগের নাম, শ্রীগৌরাঙ্গের নাম প্রায় ডুবিয়াছিল, নববিধান অভ্যুদিত হইয়া দেখ সকলের নাম পুনর্জ্জীবিত করিল। হিন্দুস্থান ঈশা, মুষা, মহম্মদ প্রভৃতি বিদেশী সাধুদিগকে বিজাতীয় বলিয়া ঘৃণা করিত; আজ দেখ নববিধানের প্রসাদে তাঁহারা কেমন শ্রদ্ধা ও আদরের পাত্র হইয়াছেন। ভারতবর্ষে প্রাচীন আর্য্যঋষিদিগের যোগ ধ্যান সমাধি লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, নববিধানের অভ্যুদয়ে সে সমস্ত পুনরুদ্দীপিত হইল। নববিধানের কি মাহাত্ম্য!! ইহার প্রভাবে আজ হিন্দুসন্তান ঈশা, মুষা, মহম্মদ প্রভৃতি বিজাতীয় সাধুর নামে প্রমত্ত হইতেছে। নববিধানের বলে শিক্ষিত যুবকেরা শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমে মাতিতেছে, ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছে। এ সমস্ত মা জগজ্জননীর প্রেমের চাতুরী। মার ইঙ্গিতে তাঁহার সমুদয় সন্তানেরা একত্র হইয়া নববিধানের প্রশস্ত অঙ্গনে নৃত্য করিতেছেন। নববিধানবাদীর হৃদয়ে ঈশা, মুষা, শাক্য, যাজ্ঞবল্ক্য, কবীর, নানক, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি সকলে নাচিতেছেন। আজ সাধুজীবন গুলি পদ্মানদীর ন্যায় দ্রুতবেগে এই ব্রহ্মমন্দিরে প্রবাহিত হইতেছে। আজ মধুমাখা মা নাম কীর্ত্তন করিয়া নববিধানবাদীরা মাতিয়াছেন। আজ কয়টি সৌভাগ্যশালী বাঙ্গালীসন্তান আনন্দময়ী মার কোলে বসিয়া মার প্রেমসুধা পান করিতেছে। বাঙ্গালীদিগের এই সৌভাগ্য দেখিয়া স্বর্গে দেবতাদিগের মধ্যে আনন্দের রোল উঠিয়াছে। স্বর্গের দেবতারা বলিতেছেন "আমাদের

ইচ্ছা হয় সৌভাগ্যশালী ভক্ত বাঙ্গালীদিগের সঙ্গে গিয়া মিশি।” কিন্তু পরলোকের নিয়ম নহে যে, সেখান হইতে কেহ সাক্ষাৎ ভাবে ইহলোক-বাসীদিগের নিকট প্রকাশিত হন, কেবল তাঁহারা আমাদের সঙ্গে থাকিতে পারেন। আজ এই নববিধানে ঈশা, মুষা, মহম্মদ, শাক্য, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি সকলেরই গৌরব বৃদ্ধি হইল। আজ এই ব্রহ্মমন্দিরে শাঁখ, কাঁশর, ঘণ্টা, গং এবং অর্গ্যান প্রভৃতি দেশীয়,বিদেশীয় অনেক প্রকার বাদ্য বাজিয়া উঠিল। আজ সিন্ধু, চট্টগ্রাম, বম্বে, মান্দ্রাজ, প্রভৃতি ভারতের নানা দেশ হইতে ব্রহ্মসন্তানেরা আসিয়া এই নববিধানের গৌরব বৃদ্ধি করিলেন। আজ আমাদের সুখ, ভারতের সুখ, পৃথিবীর সুখ। মা আজ বিশেষ দয়া করিয়া আমাদিগকে এই কথা বলিলেন “সন্তানগণ, আর তোমাদের ভয় নাই, এখন আমি আমার স্বর্গের ভক্তদল, যোগিদল সঙ্গে লইয়া তোমাদের বুকের ভিতরে বাস করিব।” বন্ধুগণ, যখন আমরা ব্রহ্মের আরতি করিতেছিলাম, যখন নিশান বরণ করিতেছিলাম, তখন আমরা বিশ্বজননীর সঙ্গে তাঁহার সমুদয় সাধু ভক্ত সন্তানদিগের আগমন অনুভব করিয়াছি। এই নববিধা-নের নিশানের ভিতর দিয়া সমুদয় ধর্ম্মবিধানের ভাব আসিতেছে। আকা-শের বিদ্যুৎ ধরিবার জন্য সমুদয় সাধুদিগের প্রত্যাদেশ গ্রহণ করিবার জন্য এই নববিধানপ্রণালী প্রস্তুত হইল। জগতের ধর্ম্মাকাশে নববিধানের এই প্রকাণ্ড নিশান উড়িতেছে। নববিধানের এই জয়ধ্বজা দেখিয়া পৃথিবীর পাপ দুঃখ দূর হইবে। জগতের প্রতি ভারতের প্রতি, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের প্রতি বিশ্বজননীর কি দয়া!! আজ যাঁহারা এই নিশান স্পর্শ করিলেন তাঁহাদিগের কি সৌভাগ্য!! আজ ভারতের, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল হইল!! এই নিশানের ভিতরে পৃথিবীর সমস্ত যোগী ভক্ত সাধু ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক আবদ্ধ রহিলেন, উড় নিশান যাও নিশান, ব্রহ্মনামের জয়ধ্বনি এবং তাঁহার সমুদয় সাধু সাধ্বী সন্তানদিগের জয়ধ্বনি করিয়া পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সমস্ত দিক্ জয় কর। জাহাজে উঠিয়া সমুদ্র পার হইয়া দূরে বহু দূরে যাও। শত্রুকুল দেখিয়া ভীত হইও না, নির্ভয়ে দেশ দেশান্তরে চলিয়া যাও। হে নববিধানের বিজয়নিশান, তোমার মধ্যে অনেক রত্ন নিহিত রহিয়াছে, তোমাকে যে স্পর্শ করে তাহার আর ইন্দ্রিয়াসক্তি থাকে না,

তাহাকে বৈরাগী হইতেই হইবে, যেখানে তোমার আবির্ভাব সেখানে পুণ্যের প্রতিষ্ঠা। পাপকে যে পরাজয় করে সেই বিজয়নিশান (নিশান অর্থ জয়)। যাহা পাপ সয়তানকে জয় করে তাহাই নববিধানের নিশান। বিবেক সিংহাসনের উপরে রাজরাজেশ্বরী বিশ্বজননী প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার সাধু ভক্ত সন্তানগণ প্রেম, ভক্তি, অনুরাগ, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি বিবিধ পুষ্পোপহারে তাঁহার পূজা করিতেছেন। যেখানে মার পূজা প্রচার হইতেছে সেখানেই নববিধানের জয়ধ্বজা উড়িতেছে। এই নিশান মার শত্রুদিগকে পরাস্ত করিবে। ইহা পৃথিবীর পাপভার, দুঃখভার দূর করিবে। ইহা জীবের কুবাসনা, দুর্ভাবনা, দূর করিবে। এই নিশান দেখিয়া পাষণ্ড, অবিশ্বাসী, নাস্তিক সকল বিশ্বাসী আস্তিক হইবে, এই নববিধানের নিশান দিগ্বিজয়ী হইবে। ইহা ভগবানের বিরোধীদিগকে মার শত্রুদিগকে পরাস্ত করিবে। এই নিশান দুর্জয় প্রতাপের সহিত অশ্বারোহণ করিয়া দৌড়িতেছে। নববিধানের প্রেরিতগণ, এই নিশান হস্তে ধারণ করিয়া তোমরা দেশ দেশান্তরে চলিয়া যাও, এই নিশানের বলে তোমরা বড় বড় বীরের কাছেও কুণ্ঠিত হইবে না। এই নিশান ধারণ করিয়া তোমরা দেশ বিদেশে গমন কর। তোমরা যেমন মাকে দেখিয়া মার সঙ্গে কথা কহিয়া সুখী হইয়াছ, এইরূপ তোমাদের ভাই ভগ্নীদিগকেও বিধানের সুধা পান করাইয়া সুখী কর।

প্রেমের গূঢ় তত্ত্ব।

রবিবার, ১৫ ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৪ শক।

অপরাহ্ণে শয্যায় পড়িয়া ভাবিতেছিলাম যে প্রেম যে বস্তু,—ইহা এত পক্ষপাতী হয় কেন? প্রেমেরই চিন্তায় নিযুক্ত হইলাম; প্রেমসম্বন্ধে চিন্তা শান্ত হৃদয়ে উত্থিত হইল; উৎকৃষ্ট সদুত্তরও লাভ হইল। কি শুনিলাম, কি বুঝিলাম, বেদী হইতে তাহাই বলিতে আসিয়াছি। বাস্তবিক, প্রেম কি, প্রেমের স্বভাব কিরূপ, ইহা কেবল যাঁহারা ভাল বাসিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। হয় পিতা মাতাকে, না হয় ভাই ভগ্নীকে, না হয় দেশের

লোককে, না হয় পৃথিবীকে ভাল বাসিয়া কি নীচ, কি উচ্চ সকল শ্রেণীর লোকেই প্রেমের আস্বাদ সুখ জানিয়াছেন। হে শ্রোতা, যদি প্রেম কিরূপ জানিতে চাও, ভাল বাসা কি বস্তু বুঝিতে চাও, তবে এই জানিতে হইবে যে, যাহাকে ভাল বাসি, তার প্রতি পক্ষপাতী হইতে হয়। পক্ষপাত শূন্য ভাল বাসা হয় না। যেমন ত্রিকোণবিশিষ্ট গোলাকার হইতে পারে না, সেইরূপ পক্ষপাতবিহীন ভাল বাসাও অসম্ভব। যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে পিতা মাতার উপরে একটা অধিকতর অনুরাগ থাকিত না, স্ত্রীর স্ত্রীত্ব, বন্ধুর বন্ধুত্ব ও পুত্রের পুত্রত্ব চলিয়া যাইত। বন্ধু বন্ধু বলিয়া কখনই পরিচিত হইতে পারিতেন না। এই যে সকল নাম, ইহা ভাল বাসাই দিয়াছে; ভাল বাসাই উপাধি দ্বারা সকলকে চিহ্নিত করিয়াছে। আমার ভাল বাসা যে পাঁচ জনের উপর, সে স্বতন্ত্র; কিন্তু হৃদয়ের অনুরাগ এক জনেরই উপর। সেই যে এক জন, যাঁহাকে ভাল বাসিয়াছি, যাঁহাতে মত্ত হইয়াছি, মুগ্ধ হইয়াছি, তাঁহার মন গুণ যেরূপ, এমন আর কাহারও নাই। এই কথা বলিতেছি, আর জানিতেছি যে, তোমরাও ইহাতে সায় দিতেছ, কেন না ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত, সংসারে প্রেমের ইহাই সার কথা। বিভিন্ন অবস্থায় সকলেই ইহা স্বীকার করেন। প্রেম যে কাণা,—এই প্রবাদের মূল কি? যদি ভাল বাসিতে যাই, এক জনকে বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিয়া আর সকলকে সাধারণ বলিয়া গণ্য করিতেই হইবে। সমুদয় মনুষ্যেতে যে অনুরাগ, সে অনুরাগের মূল্য কম। এক জনে যে প্রেম নিবদ্ধ হয়,—পিতা মাতাকে, কি সাধু সজ্জনকে, কি শ্রী ঈশাকে, কি শ্রীচৈতন্যকে,—এইরূপ অল্পের মধ্যে যে প্রেম জন্মে, তাহার মধুরতা অতিশয়; তাহাতে অত্যন্ত মিষ্টতা। যত বিস্তৃতি হ্রাস করা যায়, প্রগাঢ়তা ততই বৃদ্ধি পায়;—প্রীতি, অনুরাগ, প্রেমসম্বন্ধে এই নিয়ম। অপরাহ্নে যে প্রশ্ন হৃদয়ে উঠিল, এইরূপে সূক্ষ্মতর ভাবে তাহার মীমাংসা হইল। প্রেম যখন হয়, তখন সে কাণাই হয়; নতুবা স্ত্রীকে ভাল বাসা যায় না, আপনার ছেলে সুন্দর হয় না। পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিলেই শাস্ত্রের দোহাই দিলেই প্রেম চটিল। সকল ছেলে সমান, সকল গুরুজন সমান, এই যদি বল, দেখিবে আর প্রেম নাই, বন্ধুত নাই। ভাল বাসা দিতে

গেলেই আপাততঃ চক্ষু দুটা বন্ধ করিতে হয়। চক্ষু দুটা প্রেমের কণ্টক। প্রেম এক এক বস্তুকে সুন্দর দেখায়। মানুষ মনে করে আমার ছেলেটি যেমন, এমন সুন্দর ছেলে আর নাই। আমার ভাইএর বিদ্যা যেমন, এমন আর কারও নয়; আমার বাড়ীতে যেমন শান্তি এরূপ আর কোন স্থানেও দেখা যায় না। আমি যে আঁবের চারা পুতিয়াছি, তার যে ফল হইবে, তার মত মিষ্ট দেখা যায় না। ফল এখনও হয় নাই, ভবিষ্যতের ফলও প্রেমিকের বিশ্বাসে মিষ্ট। প্রেমেতে মানুষ বলে, আমার যে ভাঙ্গা ঘর, তার ভিতর হইতে যেরূপ প্রকৃতির শোভা দেখিতে পাওয়া যায়, আমার ভাঙ্গা জানালা দিয়া যেমন গাছ পালা দেখা যায়, এমন আর কোন গৃহের ভিতর দিয়া দেখা যায় না। ভগ্ন গৃহও এত ভাল লাগে। আমি যে নৃত্য করি এমন নৃত্য কাহারও নয়। যে আপনাকে ভাল বাসে, সে এই-রূপই মনে করে। যে কোন বিশেষ ব্যাকরণের পক্ষপাতী, সে বলে পাণিনি অপেক্ষাও এই ব্যাকরণ উৎকৃষ্ট। কোন বিশেষ কবির যে পক্ষপাতী, তার বিবেচনায় সেরূপ কবি আর ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করে নাই। প্রেমিকের দৃষ্টিতে কোন সাধুকে দেখ, চমৎকার শ্রেষ্ঠ রঙ্গে তাঁহাকে অনু-রঞ্জিত দেখিবে; এমন নাই, ভাবিবে। এমন আর নাই;—ইহাই প্রেমের মহামন্ত্র। যদি এমন আর থাকে, তবে আর প্রেম থাকে না। কেন এরূপ হয়? প্রেম যে বস্তু, তাহাতে অত্যুক্তি করিতেই হইবে। এমন কি এই অত্যুক্তিতে মিথ্যা কথাও দেখা যায়। কদাকার শিশু হইলেও পিতা মাতার নিকটে সুন্দরতম, উৎকৃষ্টতম, মনোহরতম। এই অত্যুক্তিতে মিথ্যাদোষ পড়িতেছে, অথচ ইহা পৃথিবী ক্ষমা করিতেছে। পৃথিবীর সকলেই জানে যে, ভাল বাসিতে গেলে এইরূপই হয়। ইহার নিগূঢ় অর্থ এই যে, ঈশ্বর ভিন্ন প্রেমের বস্তু আর হইতে পারে না। সমুদয় প্রেম চরিতার্থ হয়, সেই দেবদেবে প্রেম হইলে। সেই সৎস্বরূপের পদ ভিন্ন ভালবাসা কিছুতেই স্থাপিত হইতে পারে না। সর্ব্বাপেক্ষা প্রেম তাঁহাকেই কর, সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসা তাঁহাকেই কর, ঈশ্বরকে পতির পতি বল, দোষ হইবে না। তাঁহাকে পুত্র ভাব, স্ত্রী ভাব, পিতা ভাব, ঘর বাড়ী ভাব, ইহ পরলোক জ্ঞান কর, অত্যুক্তি আর হইবে না। বল, এমন বস্তু নাই, এমন বন্ধু নাই;

ক্রমাগত বল, অত্যুক্তির পর অত্যুক্তি কর, দেখিবে যে, উৎকৃষ্টতাব্যঞ্জক সমস্ত শব্দ দিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই জন্য ঈশ্বরেতেই পক্ষপাতী হইয়া প্রেম দিতে হয়। কাহাকেও যদি ভাল বাসিতে যাও, পক্ষপাতী হই-বেই হইবে, অথচ তার সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যাবাদী হইয়াও পড়িতে হয়। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি প্রেম হইলে যদি বল, এমন আর হইতে পারে না, কিছুই দোষ হইবে না। আজ প্রাতঃকালে যে রূপ দেখিলাম, সেরূপ রূপ আর কাহারও নাই; কোন কবি আসিয়া সে রূপের চিত্র আঁকিতে পারে না। এই ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্ম যিনি, তিনি যোগী, ভক্তদের শ্রেণী দিয়া গিয়া একটি অন্ধ প্রেমিকের দলভুক্ত হন, এখানে একটু গোঁড়ামির ব্যাপার। প্রেমের বস্তুকে যদি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, প্রেম জন্মিয়াছে। বল দেখি, যেমন সুখ দিয়াছেন ঈশ্বর, এমন আর কেহই দিতে পারে না। এই চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর তিনি কেবলই সুখ দিয়াছেন, একটিও দুঃখ দেন নাই, এই অত্যুক্তি কর দেখি। বল দেখি, তিনি রাধেন, আমি খাই, তিনি ধন দেন, আমি ধনী হই। সম্পূর্ণ পক্ষপাতী হইয়া বল, এমন সুখ আর কেহই দেয় নাই; ইনি এক দিনের জন্যও আমায় কষ্ট দিলেন না। যত দুঃখ ছিল সমস্ত অবসান করিয়া কেবলই সুখ শান্তি দিলেন। এত গুলি উপাসক উচ্চৈঃস্বরে বলুন, চির জীবন কেবল সুখই দিয়াছেন; একটি দুঃখ হইল না, আঙ্গুলে একটি ব্রণ হইল না, শিরে একটি আঘাত লাগিল না; অকারণ কষ্ট যন্ত্রণা, এ জীব কিছুই জানিল না। ঈশ্বর এমনই ভাল বাসেন যে, সুখের শয্যাতেই সতত রহিয়াছি, বাগান বাড়ীতেই তিনি বাস করাইতেছেন; কুবেরের ধন সম্পত্তিতে রাখিয়াছেন। যিনি এ কথা বলিবেন, তিনি কি মিথ্যাবাদী হইবেন? যদি কেহ ডাকিয়া বলে,"ওহে শোন, ঈশ্বর আমাকে অনেক ধন দিয়াছেন,অনেক সুখ দিয়াছেন, ওহে ঈশ্বর আমাকে যে আনন্দে রাখিয়াছেন, তাহা আর বলিয়া শেষ করিতে পারি না।" পৃথিবী তাহার কথা শুনিয়া বলিবে, "সত্য কি মিথ্যা? এই যে ব্যক্তি বলিতেছে, এত গোঁড়ামির কথা উচ্চারণ করিতেছে, ইহার কথা কি যথার্থ?" পৃথিবী সন্দেহ করিবে বটে, কিন্তু পৃথিবী যাহাকে মিথ্যা ভাবে, তাহার ভিতরেও সত্য আছে। তোমার প্রেমের নয়নের

কাছে, কষ্টের ব্যাপার নাই। জ্বর হইল, রোগ হইল, ধনহানি মান-হানি হইল, ঘরে বিপদ্ ঘটিল, প্রেম সকলই ভুলাইয়া দিয়াছে। পিতা আমার এমন যে, তাঁর উপর কোনও দোষ আনা যায় না। কি চমৎকার তাঁহার মুখ খানি! কি চমৎকার ঠোঁট, কি সুন্দর তাঁর হাত! আহা! তিনি যে আমায় অণুমাত্রও কষ্ট দিলেন না। এই কথা শুনিয়া কেহ বা পাগল বলিবে, কেহ বা মিথ্যাবাদী বলিবে, কিন্তু এমন সত্য কথা আর নাই। গোঁড়ামির মধ্যে যে পবিত্রতা, উচ্চতা আছে, তাহা যদি না দেখাও, তবে নিম্নশ্রেণীর ধর্ম্মশীলদের মধ্যে গণ্য হইবে। বন্ধুর পক্ষপাতী হইবে না? তিনি যে সত্য সত্যই একটী দিনও কোন ক্লেশ প্রদান করেন নাই, তিনি ত কখনও অপমান দেন নাই; কেবল সুস্থতাই সতত অর্পণ করিতেছেন। রোগ, যন্ত্রণা, শোক, অশান্তি, কিছুই তিনি দেন নাই, কেবল সুখীই তিনি করিয়াছেন। এই ভাবে গেলে বুঝিবে, প্রেম কেন পক্ষপাতী হয়। প্রেম নাকি কেবল তাঁহাতেই যাইবে, তাই গোড়া থেকে এই কথা। এমন আর নাই, এমন আর হইতে পারে না,—এই যে প্রেমের উক্তি, ইহা কেন হইল? প্রেম না কি কেবল ঈশ্বরেরই প্রাপ্য, সেই জন্য। ও আমায় ভাল বাসে, আমি ওকে ভাল বাসি। ওর যা কিছু আমার কাছে সব ভাল। যদি বল, টাকাতেও সুখ হয়, ঈশ্বরেতেও সুখ হয়, প্রেমিক কাঁদিতে থাকে। প্রেমিক বলেন, "না, অমন কথা কখন বলিও না। ঈশ্বরের মতন আর কিছুই নয়, আমার ব্রহ্মের ন্যায় আর কাহাকেও দেখা যায় না। এই যে আমার ব্রহ্ম, ইনি যেমন, মা বাপও তেমন নহেন; ভাই, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র, তেমন কেহই হইতে পারে না।" ধন যদি চুরি যায়, শরীরে যদি আঘাত লাগে, নানাপ্রকার যদি কষ্টের ব্যাপার ঘটে, প্রেমিক তথাপি বলেন, আমার ব্রহ্ম আমায় কি সুখই যে দান করেন, তাহা আমি বলিয়া শেষ করিতে পারি না। ব্রহ্ম আমার, কেবল অমৃতই ঢালিতেছেন, সুখ ও আনন্দই কেবল তিনি বর্ষণ করিতে-ছেন। প্রেমিকের কথা শুনিয়া পৃথিবী বলিবে, "লোকটা একেবারে গিয়াছে; এ ব্যক্তি যথার্থই কাণা, ব্রহ্মের স্বভাবে একটিও ব্রণ দেখিতে পায় না, ব্রহ্মের অন্যায় কখনই বলিবে না। যত ঘটনা ঘটুক না কেন, যদি কাঁটা বর্ষণও

হয়, সে সময়েও প্রেমিক বলে, এ সকলই মঙ্গলের জন্য, সুখের জন্য। এ উক্তি উপেক্ষা করিও না। নিরপেক্ষতার কথা যে বল, নিরপেক্ষতা বস্তুটা কি? পক্ষপাতী হইবে না? প্রেম দিতে গেলেই পক্ষপাতী হইতে হইবে। পক্ষপাতী হইয়া ঈশ্বরে অনুরাগী হইবে। মাকে যদি ভাল বাস, সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসিবে। এখানে পক্ষপাতী হইয়া কাণা হইতে হয়। প্রেম যদি হয়, তবে সেই প্রেম বলপূর্ব্বক কাণা করিয়া দেয়। কেবল জানিবে যে তিনিই প্রেম পাত্র তিনিই পরম সুন্দর; তাঁরই নিকটে থাকিতে হইবে। হে ব্রাহ্ম, কত বৎসর সাধন করিয়া তোমরা যোগী হইয়াছ, কত উচ্চ ভাব লাভ করিয়াছ, সে জন্য প্রশংসা করি; এখন দেখিতে চাই যে প্রেমিকের দলে মিশিলে। পিতামাতাসম্বন্ধে যে কথা প্রেমের সহিত বলিলে লোকে অত্যুক্তি বলে, মিথ্যা কথা বলে, তাই তোমাদের মার সম্বন্ধে বল। যদি ঈশ্বরসম্বন্ধে অত্যুক্তি করিতে থাক, তবে সে অত্যুক্তি সমস্ত একত্র হইলেও মার গুণের সমান হইবে না। প্রেমে মার পক্ষপাতী হইয়া কেবল তাঁর প্রেমের কথা দয়ার কথা বল, মাকে পাইবে, মাকে দেখিয়া কৃতার্থ হইবে। যদি পক্ষপাতী হইবার দরকার হইয়া থাকে, তবে খুব পক্ষপাতী হও। প্রেমে পক্ষপাতী হইয়া পড়; মা মা ভিন্ন অন্য রব আর মুখে আসিবে না।

স্নান ও ভোজন।

রবিবার, ১২ ভাদ্র, প্রাতঃকাল ১৮০৪ শক।

ধর্ম্ম অত্যন্ত সহজ এবং ধর্ম্ম অত্যন্ত কঠিন। ধর্ম্ম পৃথিবীর প্রশস্ত পথে ধুলির ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে, লইলেই হইল। ধর্ম্মতত্ত্ব গুহায় নিহিত; বহুকষ্টে তাহা উপার্জ্জন করিতে হয়; কিন্তু সহজে, খুব সহজে ঈশ্বরকে বুঝিতে পারা যায়। অনেক শাস্ত্র পড়িয়া জ্ঞানমার্গ মন্থন করিলে অবশেষে অমৃত পাওয়া যায়; নিশ্বাস ফেলিলে যেমন কষ্ট হয় না, আরাম হয়, তেমনই সহজে আরামে ব্রহ্মদর্শন হয়। বহু বৎসর কঠোর তপস্যা করিলে তার পর ইন্দ্রিয়নিগ্রহ হয়, চিন্তা শুদ্ধ হয়, মন যোগাসনে আসীন হইয়া আপনার ইষ্ট দেবতাকে যোগাসনে দর্শন করে, এই কথাই অনেকে জানেন,

কিন্তু ধর্ম্ম যে সহজ, প্রথমে আদি মনুষ্য বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। বহু শতাব্দীর ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনার পর উচ্চ ভাবের সিদ্ধ সাধক ধর্ম্মকে সহজ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। অনেক চিন্তা করিলাম, ধর্ম্ম যে সহজ, এ চিন্তাকে অতিক্রম করিতে পারিলাম না। অনেক দেশ ঘুরিলাম, ধর্ম্মের নানাপ্রকার রাজ্য ভ্রমণ করিলাম, ঘরে আসিয়া বহু সুখে রাশি রাশি রত্ন পাইলাম। বেড়াইয়া পাইলাম, ঘরে ও পাইলাম। বহু সাধনের পর বুঝিলাম ধর্ম্মকে আগে যত সহজ মনে করিতাম, তদপেক্ষাও সহজ। নিশ্বাসের সঙ্গে আগে ইহার উপমা হইত; নিশ্বাস অপেক্ষা যদি কিছু সহজ ব্যাপার থাকে, তদপেক্ষাও ধর্ম্মকে এখন সহজ বোধ হইতেছে। ধর্ম্ম চিন্তা দ্বারা, সাধন দ্বারা আয়ত্ত করিয়া দেখিলাম, ধর্ম্মের মূলমন্ত্র কেবল স্নান ও ভোজন। বিস্ময়াপন্ন হইও না; ধর্ম্মকে অতি সহজ শুনিয়া ভীত হ ও না। অদ্ভুত কথা, এই তত্ত্বরসসাগর মধ্যে লব্ধ হইবে। ধর্ম্ম আর কিছু নয়, কেবল স্নান ভোজন। সমস্ত বিধান ও সমস্ত প্রেরিত পুরুষের সার কথা স্নান ও ভোজন। পরিষ্কৃত হও, ও পরিতুষ্ট হও, এই দুই কথার মধ্যে যাবতীয় শাস্ত্র, স্বজাতীয় বিজাতীয় সমস্ত শাস্ত্র, নিহিত আছে। সহজ ধর্ম্ম উপলব্ধি ও সাধন করিতে চেষ্টিত হও। নববিধানবাদী, সহজ পথ ধারণ কর; একটি বার স্নান ও ভোজন করিলে মনুষ্য স্বর্গারোহণ করে। হিন্দুস্থানে হিন্দু প্রত্যহ স্নান ও ভোজন করেন, বুঝিতে পারুন, আর না পারুন, তিনি মহোচ্চ কার্য্য করেন। স্নান না করিয়া হিন্দুর দিন যায় না; আহার না করিয়া তাঁহার দিবাবসান হয় না। কে তোমাকে শৈশবে স্নান করিতে শিক্ষা দিল? কে তোমাকে অন্ন আহারে সুমতি প্রদান করিল? পৃথিবীর ধূলিরাশি ও উত্তাপের মধ্যে কে স্নান করিতে বলিল? শরীরের জঠরানল প্রজ্বলিত হইলে কে খাইতে বলিল? বলবতী পিপাসা ভয়ানক নির্যাতন করিলে কে জলপানে মতি দিল? স্পৃহা তোমার গুরু; অভাব বোধ তোমার দীক্ষামন্ত্রদাতা। নাওয়া খাওয়া দুইটী সহজ কার্য্য, শারীরিক প্রকৃতি সাধিত দেখিতে চায়। ধর্ম্মপ্রকৃতি তেমনই সুপথে যাইতে বলেন নাই, ভাল পথে যাইবার কথাও নির্দ্দেশ করেন নাই, পুস্তক পড়িতেও আদেশ করেন নাই। জীব প্রত্যূষে উঠিয়া যদি স্নান আহার

করিতে চায়, তবেই সে আপনার প্রকৃতির উপদেশ লাভ করিল। ক্ষুধা তৃষ্ণা শান্ত করিলে আর কিসের প্রয়োজন? একদিন পৃথিবীর পথে বালক সঙ্গীদিগের সঙ্গে বাল্যক্রীড়ায় কর্দ্দমলিপ্ত হইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল, পাঁচ জনে বলিতে লাগিল, বিবর্ণ হইয়াছে তোমার দেহ; বিশ্রী হইয়াছে তোমার শরীর অত্যন্ত ধূলি ও কর্দ্দমে, বালক হাস্যাস্পদ হইতেছে বুঝিল; কর্দ্দম লিপ্ত দেহে অবস্থান করা ভাল নয়, জানিল। শরীরে কষ্ট বোধ হইতেছে, এত মলা ধরিতে পারা যায় না; এই বলিয়া, কোথায় নদী কোথায় পুষ্করিণী, এক ঘটী জল, এক বাটী জল কোথায়, একটু জল কোথায় পাইব, এই বলিতে বলিতে সে দৌড়িল। জল যেমন গাত্রে দিল, অমনই পরিষ্কৃত হইয়া পড়িল। কাল তনু ছিল, জলে ধৌত হইয়া কি চমৎকার হইল। অত যে ময়লা ছিল শরীরে, স্নানের পর যেন নব মানুষ হইল। তুমি কি পিতা! তোমার সন্তানকে স্নান করাইয়া কোন দিন মুখখানি দেখিয়াছিলে? দেখিতে কেমন সুন্দর হয়, তাহা কি দর্শন করিয়াছিলে? তুমি কি বৃদ্ধ! স্নানের পর তোমার কিরূপ রূপান্তর, প্রকারান্তর হয়, তাহা দর্পণ ধরিয়া অবলোকন করিয়াছিলে? কি সৌন্দর্য্য প্রকাশ হয়, তাহা কি পরিমাণ করিয়াছিলে? যদি করিয়া থাক, তবে স্বীকার করিবে, স্নানেতে মানুষ নূতন হয়। যখন বৈশাখের রৌদ্রে কাট্‌ ফাটিতে থাকে, প্রস্তর সকল খণ্ড খণ্ড হয়, সে সময় শরীর স্বভাবতঃ শীতল জল অন্বেষণ করে। দেহ ঠাণ্ডা করিব ভাবিয়া তখন উত্তপ্ত জীব দৌড়াইতে আরম্ভ করে। কি সুখ তখন হয়, যখন সে জলে অবগাহন করে। গঙ্গাজলে গিয়ে ডুব দেয়, আর শরীর শীতল বোধ করিয়া আঃ—আঃ বলিতে থাকে। বৈশাখ মাস সাক্ষী; ভয়ানক রৌদ্র সাক্ষী। মানুষ জানে, এ সময় স্নান ব্যতীত সে বাঁচে না। মধ্যে মধ্যে কেবল স্নানই করে প্রাতে স্নান করে, অপরাহ্নে জলে নিমগ্ন হয়। যেন স্বভাব চায় জল; জল বিনা দগ্ধ দেহ কোন মতেই বাঁচে না। হে মনুষ্য! হিন্দুস্থান মধ্যে স্নানে মতি তোমাকে গুরু দেন নাই, বেদ বেদান্ত দেন নাই; ন্যায়বিদ্যাবিশারদ উচিত বুঝিয়া তোমাকে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত করেন নাই। মনে হইল, স্বভাব চাহিল, আর জলে পড়িলে, ময়লা প্রক্ষালন করিলে, জ্বালা নিবারণ করিলে। যেমন

স্নান করিলে, মলা গেল, উত্তাপ গেল। কিন্তু শুদ্ধ এই কথা বিজ্ঞান-বিহীন লোকেও বলিতে পারে। সুবিজ্ঞ বিজ্ঞানী বলেন, স্নানে স্বাস্থ্য সঞ্চার হয়। শরীরের মলা গেলে স্বাস্থ্য হয়; উত্তপ্ত দেহকে শীতল করিলে দেহ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া সুস্থতার পথে গমন করে। স্নানে অনেক উপকার। স্নানের পর ক্ষুধা প্রবল হয়, দেহ খাদ্য পাইবার জন্য চীৎকার করিতে থাকে। বাণিজ্য ব্যবসায়ে লোকে ধনী হয়, কর্ম্ম কার্য্যেই সময় যাপন করে, বহু অধ্যয়নে পণ্ডিত হয়, এ সমুদয় কেন? কেবল খাইবার জন্য; জঠরানল নিবৃত্তির জন্য। খাদ্য অভাবে এমনই বোধ হয়, যেন শরীর গেল, মাংস অবসন্ন হইল, মৃত্যু যেন দেহে প্রবেশ করিয়া বধ করিবে। হয় খাদ্য, নয় মৃত্যু। এই ভাবিয়া স্নানের পরই মানুষ আহার করিতে চায়। প্রকৃতি গুরু হইয়া বলিতেছেন, অন্য মন্ত্র নয়, কেবল আহার। আহারের পরই কি দেহের চাকচিক্য, কি আশ্চর্য্য লাবণ্য, কি চমৎকার অনির্ব্বচনীয় কান্তি। সমুদয় দেহ যেন যৌবনের কাল লাভ করিল। পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে নিতান্ত যে অশক্ত ছিল, দুর্ব্বল ছিল, হতশ্রী ছিল, আহারের পর পুষ্টি, কান্তি, যৌবনের তেজ, সিংহের রক্ত তাহার শরীরের মধ্যে আসিল। ঐ দেখ, ব্যাধিমুক্ত শরীর সুস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, এ ব্যক্তি সমস্ত জাতির মধ্যে প্রেম দিবে, ধর্ম্মোৎসাহ প্রদীপ্ত করিবে; কিংবা কোন বাণিজ্য ব্যবসায় কিছু করিবে। এক বার স্নান করিল, পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িল; এক বার আহার করিল, সিংহের ন্যায় বলশালী হইয়া উঠিল। সাধু যুবা, তুমি স্নান কর; আহার কর। ধর্ম্মরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম, সেখানকার লোকে কেবল স্নান করেন, আহার করেন। এ পৃথিবীতেও প্রকারান্তরে তাহাই। সংসারে শরীরসম্বন্ধে লোকে যাহা করে, ধর্ম্মরাজ্যে আত্মাসম্বন্ধে তাহাই করিতে হয়। এ উপদেশের গুরু কে? প্রকৃতি। কি কর প্রাতঃকালে? স্নান। তার পর? আহার। যাহাকে জিজ্ঞাসা কর সেই এই উত্তর দিবে। বেদ পাঠ কর না? না। স্বস্ত্যয়ন? না। ব্রতাদির অনুষ্ঠান? যাগ যজ্ঞ? না। ভক্তিরসামৃত পান, কি ত্য, কি বান্ধবদিগকে লইয়া ধর্ম্মালোচনানু কি পাঠ, চিন্তা, তপস্যাদি কিছুই কর না? বাস্তবিক সমুদায় পেষণ করিয়া

দেখিলে এক বস্তুতেই সমস্ত পরিণত হয়। কেবল বস্ত্র, স্নান ও ভোজন। এই জন্যই বোধ হয়, এক বিধানের প্রেরিত মহাপুরুষ স্নান ও ভোজনকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রত ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। দেখ, বালক যদি পৃথিবীর পথে ধূলি খেলা করে, সুন্দর রূপ লইয়া সে ফেরে না। মা জানেন, ঘরে যখন ফিরিল, তখন সন্তান কৃষ্ণবর্ণ। মা, তাহার শরীর ধৌত করিয়া দিলেন, মুখ হাত ধোয়াইলেন, পা দুখানি পরিষ্কার করাইলেন, চুল আঁচড়াইয়া দিলেন, গায়ে একটু তৈল মাখাইলেন। শরীর পরিষ্কৃত ও চাকচিক্যশালী হইল; কান্তি খুলিল। জীব তোমার জননীর জননী রোজ এইরূপ করেন। তুমি যদি স্নান না কর, স্বাভাবিক যদি না হও, মা তুষ্ট হন না; তুমিও তুষ্ট হইতে পার না। স্বর্গ হইতে যে পরিষ্কার জল পৃথিবীতে পতিত হয়, পাঁচ মিনিট্ পড়িয়া থাকিলে অত্যন্ত কর্দ্দমযুক্ত মলিন হইয়া যায়। স্বর্গের বৃষ্টিকে কর্দ্দমযুক্ত করে এরূপ ভয়ানক স্থান যে পৃথিবী,—সেখানে অর্দ্ধঘণ্টা কাল কেহ মলিন না হইয়া বেড়াইতে পারে না। শরীরে কাদা লাগিলেই বলিতে হয়, জল চাই, জল দাও। কৃষ্ণবর্ণ থাকা যায় না; প্রক্ষালিত হইয়া নূতন কাপড় পরিব, দেহে ময়লা লাগিলে কোন্ বালকের না এ ইচ্ছা হয়? কোন কোন পরিবারে রবিবারে স্নান নির্দ্দিষ্ট আছে। সে দিন সেই পরিবারের পিতা পুত্রে সকলে মিলিয়া গঙ্গাতীরে গিয়া আনন্দে স্নান করে কেন, হে বালক, এত আনন্দ কেন? সে দিন বালককে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে বালক বলে, আজ যে রবিবার, আজ যে স্নান করিবার দিন। বালকের কতই আনন্দ! যেন কোন নৃপতি রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন, যেন কোন ব্যক্তি অসীম ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেন। বালক স্নান করিয়া শীতল হইবে, সুন্দর দেহ হইবে, এই ভাবিয়া তাহার অতুল আনন্দ। যখন জীব স্নান করে, তখন প্রকৃতি সুমধুর ওষ্ঠ প্রকাশ করিয়া হাস্য করেন। যখন আমরা সংসারের ধূলাতে ও মলাতে মলিন কাফ্রির মত হইয়া পড়ি, তখন আমাদের জননী জল দ্বারা ধৌত করিয়া দেন। হাতে কালী, মুখে কালী; জল ছাড়া এ ময়লা কোনরূপেই যাইবে না। যুবা বৃদ্ধ মলিন হইয়া যখন চীৎকার করিয়া বলে, শরীর ময়লায় কেমন করিতেছে, মলা দূর না হইলে আর থাকা যায় না, অমনই প্রার্থনা

জল, আরাধনা জল, সংগীত জল, ধ্যান জল, তপস্যা জল তাহাদিগের উপর পতিত হয়। এক একটি নদী, এক একটি হ্রদ, এক একটী পুষ্করিণী। প্রার্থনা যদি নদী হয়, ধ্যান তবে সমুদ্র। যত জলের আবশ্যক, তত জলে পড়িতে হয়। সঙ্গীত পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া কেমন ঠাণ্ডা হওয়া যায়, অধিক জলে পড়িতে হইলে দূরে গিয়া ধ্যান সমুদ্রে অবগাহন করিতে হয়। পুষ্করিণীতে পড়িয়াও যদি দেখি ময়লা গেল না, নদীতে সমুদ্রেতে পড়িতে হইবে। অত ময়লা কি সামান্য জলে যায়? থাবার জলে কি ও ময়লা প্রক্ষালিত হইতে পারে? তুমি পাঁচ মিনিটের প্রার্থনায় অত রাশীকৃত মলা প্রক্ষালন করিবে? অল্প জলে সংসারের কাদা মিশাইয়া পড়িবে। অধিক জলে পড়; দুই ঘণ্টা জলে পড়িয়া থাক। যাদের অল্প মলা মলিন করিয়াছে, একটু জলে তাহাদের পরিষ্কার হওয়া সম্ভব। কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার এত ময়লা তোমাকে মলিন করিয়াছে, একটু জলে কি ও ময়লা যায়? সুন্দর যুবার গায়ে একটু ময়লা লাগিয়াছিল, একটি সংগীত জলে তাহা অপনীত হইল। তোমার আত্মা কখনই সংক্ষে প্রক্ষালিত হইবে না। যাও, ঐ ভাগিরথী তীরে যাও; ডোবায় তোমার হইবে না। জলের ভিতর ওঠ, আর মগ্ন হও। চিৎ হইয়া সাঁতার দাও; তীরে এস; জল লইয়া কলস কলস মাথায় ঢাল। উপরে নীচে জলের আঘাত লাগিতে লাগিতে বহু উপাসনার পর ময়লা যাইবে। একটু জলে যখন হইল না, তখন বেশী জল চাই, এ কথা বালকেও বলে। হে ব্রাহ্ম! যখন বেশী মলা গায়ে লাগিয়াছে, তখন কার্য্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করিবে। নদীতে যাইবে; জলে পড়িয়া ক্রমাগতঃ স্তব স্তুতি করিবে। দেখিবে চক্ষু দুটি পরিষ্কার হইল। অধিক মলা দেখিতেছ, যাও, সমস্ত অঙ্গ পরিষ্কার কর। পরিষ্কার হইলে বলিবে, মলার ভার বড় ছিল, পরিষ্কৃত শরীর লঘু হইল, শরীরের কি সৌন্দর্য্য প্রকাশিত। স্নানে শুদ্ধ হইলাম এই কি কেবল মনের কথা? না। সে দিন বিষয়হানি, অপমান, লোকের উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছিলাম, তাহা হইতেও আরাম পাওয়া গেল। ও হে তপস্যা-প্রিয়, কেন তপস্যা করিতেছ? প্রেমসরোবরে ডুব দিয়া ব্রহ্মপদতলে বুঝি পড়িয়া রহিয়াছ? ওহে জীব, তুমি কি পাপের জ্বালায় জ্বালাতন

হইয়াছ? বৈশাখের রৌদ্রে কি তাপিত হইয়াছ? নক্ষত্রবেগে নদীতে সমুদ্রেতে গিয়া ঝপাৎ করিয়া পড়; বলিবে, আঃ, প্রাণ যেন বাঁচিল। আমি ঠিক বলিতেছি, না মিথ্যা বলিতেছি? বল দেখি, এক এক দিনের গানে হৃদয় একেবারে জুড়াইয়াছে কি না? এই জন্য হৃদয় জুড়াইবে বলিয়াই স্নান করিতে অভিলাষ করি। ঐ যে আমাদের গানের ঘরটি, মন্দিরের মধ্যে ঐ একটি সরোবর। এই যে মন্দির, ইহা একটি প্রকাণ্ড সরোবর, সুবিস্তৃত নদী। এই মন্দিরের বাহিরের দিকে বৈশাখ মাস, কিন্তু ভিতরে চিরকালই ভাদ্র মাস। যেমন জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া এখানে আসিলে, অস্থির ভাবে আসিয়া এখানে জলে পড়িবামাত্রই শীতল হইলে। মা আনন্দময়ী, মা আনন্দময়ী, দুইবার বলিতে না বলিতে প্রাণ জুড়াইল। কাহার কথায় ডুব দিবে না; আমার কথায় ডুব দিবে না। কিন্তু যখনই প্রকৃতি বলিবে, যখনই অন্তরের হাড় ফাটিবে, তখনই তোমার হৃদয় হৃদয়কে বলিবে, স্নান কর, নতুবা মরিবে। এই যে মন্দিরের মধ্যে এক ব্যাপার হইতেছে, এই যে আরাধনা ও প্রার্থনা,—পাঠ ও তপস্যা, যত কিছু হইতেছে, ইহার উদ্দেশ্য প্রত্যেকের নিকট এক একটী সরোবর আনিয়া দেওয়া। এই করিলেই তোমার আমার কার্য্য হইল, পাপ কলঙ্ক মোচন করিয়া, জ্বালা দূর করিয়া শান্তি পাইব, এই স্থির করিয়াছি। আর কি চাই? ভোজন। বাহির হইতে জল লইয়া বাহিরে ঢালিলে শরীর পরিষ্কার হয়; পুষ্টির জন্য আবার আহার চাই। মলা ত গেল, পরিষ্কার ত হইল, এখন অন্তরে কিছু প্রবিষ্ট করিতে হইবে। যদি সুখ বোধ করিতে চাও, আহার করিতেই হইবে। কোথায় শক্তি পাইবে, যদি আহার না কর। বল রক্ষার জন্য নানাপ্রকার আহার্য্য বস্তু চাই। যখনই ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হও, তখনই খাদ্য অন্বেষণ কর। এক জনের কাছে বিবেক, আর এক জনের কাছে ভক্তি। ক্ষুধায় কাতর হইয়া ঈশা ভক্ষণ, মুষা ভক্ষণ, চৈতন্যকে পান, বুদ্ধকে আহার কর, ক্ষুধা শান্তি ও পুষ্টিলাভ হইবে। সে দিন গিয়াছে, যে দিন লোকে ইহাঁদিগকে ঈশ্বর বোধে আদর করিত। নববিধানের প্রারম্ভ অবধি এই জ্ঞানের অভ্যুদয় হইয়াছে, যে এই সমুদয় সাধু কেবল সাধু নহেন,

সাধুতা; কেবল জ্ঞানী নহেন জ্ঞান; কেবল প্রেমিক নহেন, ইহাঁরাই প্রেম, সুবোধ নহেন, সুবুদ্ধি। মনুষ্য হইলেন অবস্থা; সাধু হইলেন খাদ্য দ্রব্য। উপহাসের কথা নয়; আহার করিবে বলিয়া মহেশ্বর দিলেন। এই লও, ঈশাচরিত্র ও গৌরাঙ্গচরিত্রকে আহার কর। কেবল স্নান করিলেও হয় না; পাপ গেল, কিন্তু পুণ্য হওয়া চাই। পাপমলা প্রক্ষালিত হইলেই কি সমস্ত শেষ হইল? অভাবপক্ষের সাধন হইলেই কি যথেষ্ট হইল? ভাবপক্ষেরও প্রয়োজন। পেটুক ক্ষুধার সময় যেমন হাঁউ হাঁউ করিয়া ভোজন করে, সাধুরূপ শস্য যে হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্রকে সুশোভিত করিয়া রহিয়াছে, সেইখান হইতে অন্নের ধান আনিয়া ক্ষুধা শান্তি করিব। খাদ্য এমনই, যত খাই ততই খাইতে ইচ্ছা হয়। ভক্তিদুগ্ধের সঙ্গে ভক্ত অন্নকে একত্র করিয়া শরীরে প্রবিষ্ট করিব, উদরে ঢালিব; যতই এইরূপ করিব, ততই সবল হইব। আহার করিলে পর দেখিব, ছিলাম রুগ্ন মৃতপ্রায় আজ অন্নাহারে সবল হইয়াছি। তখন কেবল এই বলিব, দেখ ঈশার; বিবেক, মুষার ব্রহ্মবাণীশ্রবণ, বুদ্ধের নির্ব্বাণরূপ সত্য এমনই আহার করিয়াছি যে, খাইয়া মহাসুখী হইয়াছি। মা আমাকে যথেষ্ট আহার দিয়াছেন। বলিয়াছেন, যত দিন বাঁচিবি, যত ইচ্ছা, এই সব খা। তোমার আমার মা আর কি চান? খুব খাও তুমি, তোমার মা প্রফুল্ল হইবেন। এবার কার ভাদ্রোৎসবে এই উপদেশ, কেবল স্নান কর, কেবল আহার কর। আর ঈশাকে উপহাস করিও না। হে চৈতন্য, তব পদে নমস্কার, এই বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিও না। এবার ধান্যরূপে সাধুরা আসিয়াছেন; জলরূপে সকলে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রেরিত মহাপুরুষগণ চাল, ডাল, লবণরূপে এবার সমাগত হইয়াছেন। আর পুস্তক পড়িতে হইবে না। ঈশাবান্, চৈতন্যবান্, নির্ব্বাণবান্ যে ব্রহ্মভক্ত, যিনি সাধুদিগকে আহার করিয়াছেন, তাঁহাকে লইয়া আমি সকলকে ভোজন করি। আবার আমাকে শুদ্ধ লইয়া সকলকে তুমি খাও। এইরূপে শতাব্দী গ্রাস করুক শতাব্দীকে। শেষ শতাব্দী গ্রাস করুক, প্রথম শতাব্দীকে; দ্বিতীয়কে গ্রাস করুক তৃতীয় শতাব্দীকে। এইরূপে চতুর্থ পঞ্চম শতাব্দী সকলকে আপনাদের ভিতরে হজম করিয়া ফেলুক। হে জীব, কেবল খাও আর দেখ, তাঁহাদের

শোণিত তোমার শোণিত হইয়াছে কি না। ইহা যদি হইয়া থাকে, নব-বিধান সফল হইয়াছে, ব্রাহ্মধর্ম্ম সার্থক হইয়াছে। আর কিছু মা চান না। ময়লা হলে স্নান করাইবেন, ক্ষুধিত হইলে আহার করাইবেন। আমার মা আজ আমাকে নাওয়াইলেন, খাওয়াইলেন; পরিস্কৃত ও পরিপুষ্ট হই-লাম, এই জন্য এ কথা বিশেষ করিয়া বলিতেছি। অগ্রাহ্য করিবে না; শীরোধার্য্য করিবে। কি কথা? এক বার জল সংস্কার করিতে হয়, এক বার সাধুভক্ষণ করিতে হয়, পূর্ব্বকার বিধানের সময় বলা হইয়াছিল; নববিধান বলিতেছেন, আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর, প্রত্যহ জল সংস্কারে সংস্কৃত হইবে; প্রত্যহ ব্রহ্মপূর্ণ জলে অবগাহন করিতেছি এই ভাবিতে ভাবিতে স্নানক্রিয়া সমাধা করিবে। প্রত্যহ আহারের অন্ন পুণ্যরূপে, জল প্রেমরূপে গ্রহণ করিয়া আত্মাকে স্বর্গীয় পুষ্টি দান করিবে। এই মন্ত্রের সাধন কর। প্রত্যহ স্নান ব্রহ্মজলেতে; প্রত্যহ আহার ব্রহ্ম আহারে। ইহাতেই জগৎ বাঁচিবে। এই সহজ পথ ধরিয়া, ভাই বন্ধু, স্বর্গা-রোহণ কর।

হে দীন দয়াল, হে আমাদের অন্নদাতা, জলদাতা, শান্তিদাতা, মোক্ষ-দাতা, তোমার শ্রীপাদপদ্মে উৎসব দিবসে মিনতি করিতেছি, আমাদের শরীরকে যেমন জল দ্বারা শুদ্ধ কর, মা হইয়া হাত ধরিয়া তেমনই তোমার প্রেমগঙ্গাতে আমাদিগকে স্নান করাইয়া ভাল কর। দেখ, আমরা সংসার-কর্দ্দমে লিপ্ত হইয়াছি; তোমার কাছে মুখ দেখাইতে পারি না; ভাই বন্ধুরাও কেহ কাছে যাইতে দেয় না। গায়ে ময়লা কেবল নয়, দেখ মনে কত ময়লা! রাশি রাশি পাপ সঙ্গে করিয়া উৎসবে আসিয়াছি। কোথায় তোমার জল, যেখানে জলসংস্কারে সংস্কৃত হইয়া সেই প্রেরিত পুরুষ পবিত্রা-ত্মাকে দর্শন করিয়াছিলেন, সেইখানে একবার মগ্ন হইব। মন্দির মধ্যে একবার সেই জল আনিয়া দাও; অবগাহন করিয়া পবিত্রাত্মাকে দর্শন করি। প্রার্থনা আমি কেন করি? আরাধনা করিলে কি হইবে? এক বার দুইটি হাত ধরিয়া ছেলেকে যেমন মা জননী স্নান করান, তেমনই একটু তৈল মাখাইয়া, গায়ে একটু হরিদ্রা মাখাইয়া, আমাদিগকে স্নান করাও। কাল অঙ্গ আর রাখিব না; এবার ভাগবতী তনু করিয়া দাও। জ্বালায় প্রাণ

অস্থির; ঠাণ্ডা কর। গরম দেহের উপর শীতল জল এক বার ঢাল। এক বার ব্রহ্মজলের ভিতর ডোবাও। ভয়ানক উত্তাপ; পাপের তেজ শরীরকে কাতর করিয়াছে। আর অন্য মন্ত্র লইব না; এবার জলসংস্কারে সংস্কৃত হইব। এ জল আত্মার পানীয়; জড় জল নয়। এ আমার ব্রহ্মপদনিঃসৃত জল। এ হরির জল যেমন শরীরের উপর পড়িবে, অমনি আত্মার উপরেও পতিত হইবে। এই জলে অবগাহন করিলাম; আমার শরীরের ময়লা গেল; জ্বালা যন্ত্রণা দূর হইল। এবার ভাই বন্ধুদের কাছে মুখ দেখাইলেই বলিবেন, ঠিক্ হইয়াছে; প্রাণের ভিতর হইতে গভীর কলঙ্করাশি চলিয়া গেল। হে প্রাণেশ্বর, তুমি অনুগ্রহ কর, প্রত্যহ স্নানকে ধর্ম্মক্রিয়ার মধ্যে করিয়া স্নানের ঘরকে যেন উপাসনার ঘর করিতে পারি। ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া যখন স্নান করিব, কিংবা নদীতীরে গিয়া যখন স্নান করিব, জ্বালা জুড়াইবার জন্য, ময়লা দূর করিবার জন্য জলে অবগাহন করিব। বলিতে যেন পারি, এই জলের প্রতিবিন্দু ব্রহ্মবিন্দু হউক। এই জল যেমন আত্মার গায়ে লাগিবে, অমনই নূতন জীব হইয়া যাইব। জলে ডুব দিব আর বলিব, ডুবিলাম ব্রহ্মসাগরমধ্যে। বুঝিব যে তাহাতেই দেহ মন শুদ্ধ হইল। দেখিব অহঙ্কারী স্নান করিয়া বিনয়ী হইল, কামাচারী জিতেন্দ্রিয় হইল; লোভী সন্ন্যাসী বৈরাগী হইয়া স্নান করিয়া উঠিল। হে মাতঃ, বিশ্বজননি, ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে এই স্নান প্রবর্ত্তিত কর! এঁরা যেন প্রতিদিন ব্রহ্মজলে স্নান করিয়া এই দেখান যে স্নানের আগে যে অসুরের মতন ছিল, স্নানের পর সে এমনই হইল, ইচ্ছা হয় যেন স্কন্ধে করিয়া নাচিতে থাকি। স্নানের পর কাহারও যেন অসুখের মুখ দেখিতে না হয়। প্রত্যেকের স্নানের ঘর মন্দির করিয়া দাও; তীর্থ করিয়া দাও। জল লইয়া যেন আর বৃথা ঘাঁটাঘাটি না হয়; জলের স্নানকে ব্রহ্মেতে স্নান করিয়া দাও। ময়লা তাড়াইতে হইলেই ব্রহ্মজলে খানিক বসিয়া থাকিব। বলিব, রাগ, তুই যাবি না? আজ রাগ একেবারে না গেলে স্নানের ঘর পরিত্যাগ করিব না। লোভ ছাড়িল না? স্নানের ঘর কোন মতেই ছাড়া হইবে না, কেবলই জল ঢালিতে থাকিব। অল্প জলে হইল না, আরও জল ঢালিব। বৈরাগী, সন্ন্যাসী, ব্যাঘ্রচর্ম্মধারী হইয়া তবে ঘর পরিত্যাগ

করিব। হে দেবি, দয়া কর, অঙ্গে না হয় নদীর ভিতর লইয়া যাও; ধোও মা ধোও। মা জগদীশ্বরি, বল প্রকাশ কর। তোমার অসুর সন্তানের এত পাপ বুঝি যাইবে না? পঁচিশ বৎসরের পাপ হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত গিয়াছে। ঢাল জল, এই যে একটু একটু দাগ উঠিতেছে; এবার কাম ক্রোধ লোভ সব যাইবে। আর অসুরের মত থাকিব না; স্নানের পর শরীর মন ধক্ ধক্ করিবে। লোকে বলিবে, এ যেন সে নয়; সে দিব্য বর্ণ কেমন করিয়া ধরিল! আহা! তখন আপনার রূপ দেখিয়া আপনি মোহিত হইব। স্নান যখন হইল, উপাসনা ত এখানেই হইল। তার পরই দেখি, কত খাদ্য সাজাইয়া রাখিয়াছ। মা এত খাব? সোণার থালায় এত খাবার সাজাইয়াছ? কলাপাতা, শালপাতা বই আহারের পাত্র আছে যে জানিত না, তার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছ বুঝি? আজ বুঝি তাহাকে গৌরাঙ্গ বলিয়া আদর করিয়া খাবার নূতন জায়গা দিয়াছ? এক শত বার মন্দিরে গিয়া যাহা না হইয়াছে, হিমালয়ে গিয়া ধ্যান করিয়া, বেদ পুরাণ পাঠ করিয়া যা না হইয়াছে, আজ স্নান করিয়া তাহা হইল। আজ যে মা স্নানের পর চেলির কাপড় পরা ছেলে দেখিয়া তোমার মুখে হাঁসি ধরিতেছে না। মাথায় জল ঢালিয়া পরিত্রাণ করিলে? আমি যে বড় লোভী ছিলাম, সংসারের ক্রীতদাস ছিলাম, সংসার আমার গায়ে যে অলকাতারা দিয়াছিল। আজ যে আমি নেয়ে পরিত্রাণ পাইলাম। নেয়ে যদি এত সুখ, না জানি ভোজনের কত সুখ। মা, কত খাব? সোণার পাত্রে কত খাব? আহা! ঈশা মনুষ্যত্ব ছাড়িয়া সুখে খাইব বলিয়া আজ অন্ন হইয়াছ? গুপ্ত চোর, ছদ্মবেশ ধরিয়াছ? বঙ্গদেশোৎপন্ন অন্নরাশি, অন্ন ত তুমি নও; তোমার ভিতর আমার প্রাণের দাদা ঈশা আছেন। তোমাকে খাইয়া ঈশাবান্ হব? অন্ন! অন্ন! আমার মুখে তুমি যাইবে? ভাই গৌরাঙ্গ, তুমি যখন নবদ্বীপ ছাড়িয়া স্বর্গারোহণ করিলে, যখন তোমার নবদ্বীপলীলা, ভারতলীলা শেষ হইল, তারপর কেউ তোমার সন্ধান পাইল না। তার পর তুমি কি মিছরির সরবৎ হইলে? জলবিন্দু হইলে? নববিধানের বিধাতার আজ্ঞায় পুরুষাকৃতি ছাড়িয়া সলিল হইলে? তোমার তুমিত্ব ভাবরূপে পরিণত হইল? মা আনন্দময়ি, খাওয়া দেখিয়া

তুমি হাসিতেছ? সাধু সন্তানকে ভোজনের সামগ্রী করিয়াছ? আর ত মন্দিরে যাইবার দরকার নাই। ঐ স্নানের ঘর, এই ভোজনের ঘর। ঐ ঘরে পরিষ্কার হয়ে এই ঘরে কত খাবার খাইব। আজ কি খাবার খাইতেছি, গরিবের ছেলে কেবল ভুট্টা, মোটাচালের ভাতই খাইয়াছি, তাও পেট ভরিয়া খাইতে পাই নাই। ওহে দেবগণ, সাক্ষী হও; উৎসবক্ষেত্রে দেখিয়া যাও, খেয়ে মানুষ স্বর্গে যাইতেছে। খেতে খেতে চক্ষু হইতে দর্ দর্ করিয়া জল পড়িতেছে। সাধুরা কেউ মিষ্টান্ন হয়ে কেউ দুগ্ধ হয়ে উপস্থিত। আহারের পর ভিতরে ঢুকিয়া যে যার নিজমূর্ত্তি ধরিলেন। বুকের ভিতর এই যে ঈশা নাচে, গৌরাঙ্গ নাচে, ধ্রুব প্রহ্লাদ নাচে। ওই যে তাঁরা বলিতেছেন, ওরে তোর ভিতরে আসিবার জন্য ভাত হইয়াছিলাম। তোর আত্মার মধ্যে মানুষ কিরূপে আসিবে? তাই খাবার বাটীতে গেলাম, তাই তোর জলের কুঁজোতে প্রবেশ করিলাম, আবার এখন নিজমূর্ত্তি ধরিয়াছি। মা আনন্দময়ি, নেয়ে খেয়ে পরিত্রাণ হয়, এই সংবাদ তুমি ঘোষণা কর। দুঃখী পাপী সব পরিত্রাণ পাইবে। খুব কসে নাওয়াও, আর খুব কসে খাওয়াও। কি কচ্চ? কি বল্‌ছ? আজ দেখিতেছি কেবল যে কর্‌বার কাজ। মা, নদীতে ডুবাইয়া নূতন কাপড় দিও; অমৃত সরোবরে স্নান করাইয়া পাঁচ ব্যঞ্জন ভাত দিও। তোমার হাতের রান্না ভাত খাব, অসাত্ত্বিক রান্না আর খাব না। মা আনন্দময়ি, তুমি কেমন রাঁধ! ঐ ঈশা ঐ চৈতন্যকে তুমি কেমন রাঁধিয়াছ! বৈষ্ণবেরা পারেন নাই, খ্রীষ্টবাদীরা পারেন নাই। তুমি আজ সব সাধুদের গাছের ফল করিলে মিষ্টান্ন করিলে? খুব খাই, খুব খাই, উদর পূর্ণ করি। স্নান করিয়া শীতল হব, আহার পান করিয়া পুষ্ট হব, এই বলিয়া আজ উৎসবে নাচিব, গাইব। তোমার অমৃত পুত্রদের অমৃত চরিত্র আহার করাও! মা, ভিক্ষা চাই; করুণাসিন্ধু, যেন ভাল করিয়া স্নান করি প্রতিদিন, আহার করি প্রতিদিন; ভক্তবৎসল হরি, দয়া করিয়া আজ আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

মুক্ত অবস্থা।

রবিবার, ৫ চৈত্র, ১৮০৪ শক।

আমরা সকলেই অল্প বা অধিক পরিমাণে ধর্ম্মসাধন করিতেছি, কিন্তু কি হইব, পরিত্রাণের অবস্থা কাহাকে বলে, তাহা কি আমাদিগের আলোচনা করা কর্ত্তব্য নয়? কতকগুলি পাপ ছাড়িলেই কি কৃতার্থ হইলাম? সংযতেন্দ্রিয় হইলেই কি স্বর্গ লাভ হইবে? সংসারীদিগের ন্যায় হইলাম না, দয় ধর্ম্ম কিছু পরিমাণে উপার্জ্জিত হইল, ইহাতেই কি আমাদের আশা পূর্ণ হইবে? শাস্ত্রকে জিজ্ঞাসা কর, কি বলেন। হিন্দুশাস্ত্র, খ্রীষ্টশাস্ত্রের স্কন্ধে হস্ত দিয়া একপ্রাণ একবাক্য হইয়া বলিতেছেন, দ্বিতীয় বার জন্মগ্রহণ আবশ্যক, নতুবা স্বর্গ প্রবেশ করা যাইবে না। বাস্তবিক মুক্ত হওয়া, স্বর্গ লাভ করার অর্থ আর কিছুই নয় দ্বিজ হওয়া, দ্বিতীয়বার জন্ম লওয়া। পিতা মাতার নিকট জন্মগ্রহণ করিয়া যেমন পৃথিবীতে আসিয়াছি, তেমনই স্বর্গস্থ পিতার নিকটে জন্ম লইয়া স্বর্গে আসিব। দুই চক্ষু দুই কর্ণ লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া সংসার ক্রিয়া সাধন করিতেছি; এইরূপে বিশ্বাস ভক্তি, পুণ্য আনন্দ লইয়া, জ্ঞানচক্ষু বিবেক কর্ণ লইয়া, ভূমিষ্ঠ হইয়া, ভূমি পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে আরোহণ করিয়া স্বর্গক্রিয়া সমাধা করিব। ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক, মুক্ত ও বদ্ধ স্বর্গবাসী ও রসাতলবাসীর এই প্রভেদ। তুমিও সাধু নও, আমিও সাধু নই যদি বড় লোক হই তবে সে ব্রহ্মকৃপা বলে। ব্রহ্মমন্দিরে আসি বলিয়াই যে আমরা স্বর্গের লোকদের মধ্যে পরিগণিত হইব, তাহা নহে। দক্ষিণে ঐ যে ভাই বিনয়ী, বামে উনি সৎকর্ম্মশীল দয়ালু, তুমি জিতেন্দ্রিয়, আমিও সৎপ্রকৃতি। চারিজনেই পৃথিবীর ভাল লোক। সংসারে ভাল মন্দ আছে, ব্রাহ্ম অব্রাহ্ম আছে আমরা না হয় পৃথিবীর ব্রাহ্ম হইলাম, কিন্তু সে রাজ্য বহু দূরে, যেখানে আমাদের উপনীত হইতে হইবে।* জীবন-ঘোড়া চলিতেছে সংসারের ভিতর। সংসার পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গের প্রথম সোপান জীবন অশ্ব স্পর্শ করিয়াছে। পৃথিবীতে দশ হস্ত উপরে বসিয়াছি; দুই তালা তিন তালা ঘর আছে, উচ্চ ছাদে বসিয়া এ কথা বলা যায়। ইহাকে ধর্ম্মরাজ্যে উচ্চপদারূঢ় বলা যায় না। ইহারা ভূমি স্পর্শ করিয়া আছে, মলিন

পৃথিবীকে অবলম্বন করিয়া আছে; কিন্তু গগনবিহারী ভূমি স্পর্শ করে না, পৃথিবীর অবলম্বনকে অবলম্বন বলে না। পল যেমন স্বর্গের বর্ণনা করিয়াছেন, অথবা হিন্দুশাস্ত্রে যে বর্ণনা আছে, তাহা হইতে আমরা বহু দূরে। রাগ গেল, গেলই; রসনা মিথ্যা বলে না,—বলে না। ঐ দেখ, কত অক্রোধী কত সত্যবাদী। তুমি দান কর, তুমি যশস্বী হইয়াছ? ঐ দেখ কত লোক যশস্বী। হে ব্রাহ্ম, এই বলিয়া তোমাকে সুখ্যাতি পত্র দিতে পারি, তুমি পৃথিবীর ব্রাহ্ম; তুমি দুই হাত দুই পা বিশিষ্ট জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এ অবস্থায় থাকিলে চলিবে না; সেখানে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি যেখানে প্রবেশ মাত্র আপনাকে পূর্ব্বের লোক বলিয়া চিনিতে পারিবে না। আত্মবিস্মরণ সেখানকার একটি লক্ষণ। আত্মবিস্মরণ যদি না হইয়া থাকে, অমনই বুঝিতে হইবে যে এ ব্যক্তি স্বর্গবাসী নয়। পৃথিবীর লোক তোমাকে রাজা করিতে পারে, উচ্চপদস্থ করিতে পারে, কত প্রশংসা করিতে পারে, কিন্তু মুক্ত না হইলে সে স্থান তোমার নহে। সেখানকার প্রথম প্রশ্নেরও উত্তর তুমি দিতে পার না। এখনও আপনাকে চিনিতে পার? যে ব্যক্তি কার্য্য করিতেছিল, সেই তুমি? যার বাপ মা মানুষ, সেই তুমি? সংসারীদের দোকানের লোক তুমি? নাম উপাধি তোমার সেই? হাঁ। জাতিভেদসূচক পদবী সেই? হাঁ। তুমি সেই লোক স্বীকার করিতেছ? জাতিভেদ নাই? যাহাদের এইটুকু মাত্র উন্নতি হইয়াছে, তাহাদের অবস্থার উন্নতি বলিতে হইবে, যথার্থ দ্বিজ তাহারা নহে। পুরাতন মানুষের প্রাণত্যাগ ও নূতন মানুষের জন্ম না হইলে স্বর্গরাজ্য হইবে না। গুণের তারতম্যে স্বর্গবাসী, পৃথিবীবাসী হয় না। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভাব দেখিয়া বোঝা যায় আত্মবিস্মরণ হইল কি না? সে রাজ্যে প্রবেশ করিলেই মনে হয়, কৈ আমি ত দোকানে কাজ করি নাই; আমি ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি নাই; নৈহাটী ভাটপাড়ায় আমি বাস করি নাই। আমার পিতা মাতা পৃথিবীর লোক মনে হয় না। আমার সঙ্গী অমুক অমুক ছিল, শুনিতে পাই, কিন্তু চিনিতে পারি না। ছেলেবেলা রাগ ছিল, কি কি ছিল শুনিলে উপন্যাস মনে হয়, আমার কিছুই ছিল না। আমি কে? এক জন মানুষ যে এইমাত্র

জন্মিয়াছে সদ্যোজাত শিশু আমি। ঈশ্বরের কাছে জন্মিয়া তাঁহাকে পিতা বলিয়া মানি। স্বর্গের ভূমিতে জন্মিয়াছি; স্বর্গীয় ভাই ভগিনী; স্বর্গীয় ভূত ভবিষ্যৎ; স্বর্গীয় তনু, স্বর্গীয় হৃদয়; এই আমি জানি। দ্বিতীয়বার জন্মগ্রহণের অর্থ এই যে প্রথম জন্ম অস্বীকার। ইহা যদি না হয়, দ্বিতীয়বার জন্ম কেন বলা হইল? কেন উন্নতি শব্দ প্রয়োগ করা হইল না? ছোট অশ্বত্থ গাছ বড় হয়, ছোট মানুষ বড় হইবে, এই কেন বলা হইল না? মহাজনেরা বলিয়াছেন, জীবিত মানুষ মরিবে, বিভিন্ন মানুষ আসিবে। সুতরাং চিহ্নও থাকিবে না। গাছ দগ্ধ হইলে তাহা হইতে কি বৃদ্ধিশীল শোভাযুক্ত পল্লবিত কুসুমিত তরুর উৎপত্তি হয়? না। একটি ছেলে মরিয়া গেল, তার মধ্য হইতে কি কেহ একটি রাজার মত সুন্দর ছেলে বাহির করিতে পারে? না। যখন মরিল, নাট্যশালার অভিনয় শেষ হইয়া গেল। যদি দেখি আর এক জন মানুষ নূতন তনু, নূতন ভাব লইয়া আসিল, তবে বলিব, ব্রহ্মভক্ত ব্রহ্মরাজ্যবাসী ইনি। যদি কেহ দেখান, তিনি এখন সংসারের টাকা কড়ি ভালবাসেন না; ছোট ছোট টাকা কড়ি ধর্ম্মের ভিতরে হয়ত ভালবাসেন। আগে সংসারের কথা বলিলে রাগিতেন, এখন ধর্ম্ম-সম্বন্ধে রাগেন। ইহাতেই বোঝা যায়, পুরাতন মানুষের চিহ্ন রহিয়াছে। আমি বড় লোক বলিয়া যশস্বী হইবার ইচ্ছা নাই, কিন্তু হয়ত ধার্ম্মিক বৈরাগী বলিয়া যশ পাইবার ইচ্ছা আছে। তুমি হয়ত মনে কর পৃথিবীর লোকে আমকে কি বলে, আমি সে বিষয় গ্রাহ্য করি না; সংসারের লোকে আমায় প্রশংসা করে না, বাহবা দেয় না, তবে কি আমি সাধু নই? তুমি দুই লক্ষ লোকের সহানুভূতি ছাড়িয়া পাঁচজন সাধুর বাহবা চাহিতেছ? সাধুদের সহানুভূতি পাইলে তবে তুমি ধর্ম্ম উপাসনা করিবে? লক্ষ লোকের সহানুভূতি হইতে দুই জন সাধুর সহানুভূতি প্রবল। তুমি যে কেবল ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করিতেছ, তাহা নহে; লাভের চেষ্টা করিতেছ। তোমার জীবনে আগেকার গন্ধ টের পাওয়া যাইতেছে। জীবন ফিরিয়াছে মাত্র। জীবনের কামনা, বাসনা, আশা ছিল সংসারে, আনিয়াছ ধর্ম্মে, এই কেবল প্রভেদ। আগে কেবল সহোদর সহোদরাকে ভাল বাসিতে; এখন ব্রাহ্মকে ভাল বাস, আর একটু মায়া অধিক, একটু অনুরাগ অধিক আপনার

সহোদর সহোদরার প্রতি আছে। ইহাঁরাও ভাল, তাঁহারা আর একটু সুন্দর। এবাড়ী ভাল, পৈতৃক বাড়ী আর একটু সুন্দর। বিপদ আপদ পড়িলে আগেকার আত্মীয়দের দিকে মন যায়। আপনার মার পেটের ভাই, সে এ সময়ে একটু সহানুভূতি দিবে মনে হয়। তবে ত সে মানুষ আছে যে পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। কে সে? সে দিন বাগানে পোড়াইয়া আসিলাম, সে মানুষ আবার কিরূপে আসিবে? যে পুস্তক দগ্ধ করা হইল, সেই পুস্তক আবার ছাপা হইবার প্রস্তাব? আগেকার সম্পর্ক যদি হৃদয় মনকে টানে, বুঝিব তুমি জীবন উন্নত করিয়াছ, নূতন জীবন নহে। যে ঈশার ন্যায় শব্দ করিয়া বলিতে পারে, "কে আমার ভাই? কে আমার মাতা? যে স্বর্গস্থ পিতার কার্য্য করে সেই পিতা মাতা ভাই।" তুমি কি সেই ব্যক্তি? ব্রহ্মের উদর হইতে জন্মিয়াছ বলিয়াই তুমি ভাই ভগ্নী বল? তুমি সংসারের সম্পর্ক মান না? কুবুদ্ধিপরায়ণ লোকের ঠিকুজি কুষ্ঠি যে দগ্ধ হইয়াছে; সে মানুষ যে আর নাই। ব্রাহ্ম হইলেই ভাই। যাঁর টান আছে পুরাতন বাড়ী, পুরাতন দোকান, পুরাতন গ্রামের দিকে, সে পুরাতন লোককে নূতন হইতে অনেক দিন লাগিবে। নূতন জীব হইলেই দেখিব, পুরাতন আকর্ষণ নাই, পুরাতন টান মায়া নাই; স্ত্রী পুত্র পরিবারের পুরাতন মানুষের সঙ্গে সেগুলির সহমরণ হইয়াছে। সে আগেকার সম্পর্ক লুপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মবংশের সম্পর্কেই ভাই ভগ্নী; এই সম্পর্কেই গ্রাম, বাড়ী, পাড়া, দেশ, রাজ্য। ধর্ম্মের সম্পর্কে সকল সংযুক্ত। রক্তের টান নাই কেবল স্বর্গরাজ্যের টান। পুরাতন জীব বুদ্ধিতে চলিত, নূতন জীব এখন কেমন বিশ্বাসে চলে! যে মানুষ দেখিয়া শুনিয়া পড়িয়া সিদ্ধান্ত করিত, দশ জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া তবে কোন কথা বলিত, সে মরিয়াছে। এখন এই নবকুমার কি করেন? নবকুমার বলেন, খাইতে পাই না পাই, ভাবিব না। বলিব, যদি কেহ আপনার খাইবার ব্যবস্থা আপনি করেন, সংসারের উপর কতক নির্ভর করেন, তাঁহার ভিতরে দুর্গন্ধ জীব উঁকি মারিতেছে। যদি কেহ বলেন, এ পথ ঠিক কি না, যদি সন্তানদের মৃত্যু হয়, পাঁচ পয়সার অধিক পাওয়া যায় না, ইহাতে যে স্ত্রীপুত্রের প্রাণ রক্ষা হয় না; সে ব্যক্তি পুরাতন গ্রামের

লোকই রহিয়াছে। নব গ্রামের লোক সে নয়। নূতন জীব প্রমাণ করিতে হইলে বিশ্বাসের লোক হইয়াছেন, দেখাইতে হইবে। প্রাচীন জীবনে যাহা কিছু বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য করিতেন, বিদ্যা ব্যয় করিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন, তাহা আর এখন করেন না। সংসার হইতে দুইটী টাকা লই, একথা তিনি বলেন না। যে বলিত, সে ত নাই। সংসারের টাকা স্পর্শমাত্র তাঁর সন্তান স্ত্রীর হাত খসিয়া যায়। সংসারের টাকা হাতে পড়িবা মাত্র যদি বলেন, "হাত গেল, জ্বলিয়া মরিতেছি" তবেই জানিতে হইবে পূর্ণবিশ্বাস আগে হইয়াছে। যত ক্ষণ ভয় রহিয়াছে, তত ক্ষণ ভাবিবে. সাত টাকা নিজে আনিব, পঞ্চাশ টাকা ব্রাহ্মধর্ম্ম হইতে লইব; ততক্ষণ তুমি পৃথিবীর ব্রাহ্ম। যাই বিশ্বাস হইল, আর পৃথিবীর টাকা লওয়া হইবে না। বুদ্ধিতে পুরাতন জীবন, বিশ্বাসে নূতন জীবন। বুদ্ধি ভালমন্দ হইতে পারে। কেহ ভাল, কেহ মন্দ; কেহ ব্রাহ্ম, কেহ অব্রাহ্ম। ব্রাহ্ম হইলেই যে এই শ্রেণীভুক্ত, তাহা নহে। যিনি বিশ্বাসে হিমালয় টলাইতে পারেন, তাঁহার নিজের চিন্তার শেষ হইয়াছে; তিনি অন্ধকারে শূন্যে ঘর প্রস্তুত করিতেছেন। যেখানে মানুষের চিন্তা যায় না, সেখানে তিনি বাস করেন। হে বন্ধুগণ, এক জন ঈশ্বরের মত নিষ্পাপ, আর একজন পাপী, এ প্রকার বর্ণনা আমি করি নাই। এক দিনে পাপশূন্য হইয়া যায়, এ কথা বলি না। ওপ্রকার অবস্থায় যাই নাই, কেহ একথা বলিতে পারিবে না। নিষ্পাপ হইবার কথা বলা হইতেছে না। বুদ্ধিজীবী ছিলে, বিশ্বাসজীবী হও, এই বলা হইতেছে। আপনি আপনার পরিত্রাণের চেষ্টা করিতেছিলে, ঈশ্বরের কথা অবলম্বন কর। তোমারও বেদ বাইবেল আছে ত? তাহার একটি শব্দও ভ্রান্ত নয়। সেই অনন্তবেদকে ধরিয়া আগুনে মাথা দিতে হইলে দিবে; মৃত্যুমুখে দাঁড়াইতে হইলে দাঁড়াইবে। এ ভাবে নূতন জীবন হইয়াছে কি না দেখ। একটু পাপ থাকিলেই যে সংসারীদের দলভুক্ত হইবে, তাহা নয়। তাহা পাপমূলক নয়, দুর্ব্বলতামূলক। বিশ্বাসীর জীবন, ধার্ম্মিক পুরাতন জীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রশংসা ইহাতে হইতে পারে না হইতে পারে, কিন্তু নবজীবন লাভ হইবে। আমরা নূতনরাজ্যের ভাই ভগ্নী পাইয়া বন্ধু সঙ্গী পাইয়া কৃতার্থ হইতেছি; নূতন জীবনের সৌরভে আমোদিত হইয়াছি। আর পুরাতন

জীবন নয়, সে পুরাতন রকমের আরাধনা আর নয়, আগে দোকান করিয়া টাকা উপার্জ্জন করিতে, এখন আর তাহা নয়। নূতন সম্পর্কে পুরাতন সম্পর্কের বিলোপ। নিজ বুদ্ধির লোপ ও বিশ্বাসভূমির অবলম্বন। এই প্রকার নূতন লোক ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলীতে দেখিতে চাই। চণ্ডালত্ব পরিত্যাগ করিয়া কলিতে সুব্রাহ্মণ হও। দ্বিজ যে নয়, সে কিরূপে পরিত্রাণ পাইবে? সে কিরূপে স্বর্গে যাইবে? অতএব ব্রাহ্মগণ; সংসার ছাড়িয়া সংসারী ব্রাহ্ম হইলে; দ্বিজ হইয়া এখন স্বর্গে ভ্রমণ কর।

হে দীনবন্ধু, হে দ্বিজদিগের হৃদয়ভূষণ, এই লোকেরা ক্রমাগত সংসারের বোঝা বহন করিয়া কর্ম্ম সাধন করিতেছে, সংসারের পথে বহু চেষ্টায় পুণ্যশান্তি সঞ্চয় করিতেছে, স্বর্গের নূতন জীবনের কথা শুনিয়া ইহারা অবসন্ন হইবে। চলে এসে শুনিলাম, এ স্বর্গের পথ নয়? রৌদ্রের কষ্ট, বৃষ্টির কষ্ট পাইয়া আসিলাম, এখন দুই চারিটি ভাই বন্ধু বলিতেছে, এ পথে চলিও না; এপথে স্বর্গরাজ্য পাইবে না। কোন্ দিকে সে রাস্তা? যে দিকে ঈশা গৌরাঙ্গ চলিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিল তোমার ঈশাকে, তোমার পিতা মাতা আসিয়াছেন এখানে, এক বার দেখিলে না? শুনিবামাত্র ভাবিলেন যেন ধর্ম্মের ক, খ, কাটা হইল; হৃদয় উত্তেজিত হইল; তিনি বলিলেন, কেরে মা বাপ ভাই বন্ধু কে? আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা যে পূর্ণ করে, সেই আমার সর্ব্বস্ব। প্রিয় ঈশার পদচুম্বন করিয়া বলিতেছি, হে ঈশার পিতা, সেই সুমতি পাপিষ্ঠদের অন্তরস্থ করিয়া দাও। এখনও অনেকটা টান আছে সংসারের দিকে। উপাসকদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তোমার সম্পর্কে সম্পর্ক বোধ হইয়াছে কি না? ঈশার লক্ষণ জীবনে দেখা গিয়াছে কি না? তিনি যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, সে ব্রাহ্মণত্ব কোথায় হেরিব! শুনিয়াছি একটি পরমহংস আছেন, তাম্র খণ্ড দিলে তাঁহার হাত বাঁকিয়া যায়; বোধ হয়, কে যেন আগুন দিল, কে যেন বিষ দিল, সে পরমহংস তোমার সন্তান। আমি ত তোমার কাছে শিখিলাম, এখন পরীক্ষা কর। পৃথিবীর এক টাকা হাতে দাও, লক্ষ টাকা হাতে দাও, হয়ত সেই টাকা লইয়া আমরা অকুণ্ঠিতভাবে সংসারে ব্যয় করিব। আমাদের মা বাপ কি সংসারের দোকানদার? আমরা সেই পুরাতন জায়গায় আছি? টাকা ছুঁলাম, হাত বেঁকে গেল না,

কোথায় স্বর্গরাজ্য, আর কোথায় আমি? কবে যাব দ্বিজদের বাড়ীতে? কবে শ্রীগৌরাঙ্গের মত মত্ত হইয়া নূতন জীবনের পরিচয় দিব? এখনও পুরাতন রক্ত আছে, ধর্ম্মের কবিরাজ বলিতেছেন, এখনও পুরাতন জ্বর যায় নাই, নাড়ী গরম রহিয়াছে; ধর্ম্মবন্ধুদের দেওয়া পয়সা কম হইলে কি দিতে বিলম্ব হইলে ধনপিপাসা এখনও টের পাচ্চি। অহঙ্কারের গর্ম্মি এখনও আছে। পুরাতন জ্বর যদি থাকে, পুরাতন পাপের রক্ত আছেই। মরি বাঁচি আর এরক্ত বক্ষে ধারণ করিতে পারি না। শীঘ্র পরিত্রাণ কর। শীঘ্র পরিত্রাণ কর। এখনও তোমাকে মা বলে ডাকি না? আর ও মা আছে? ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গ এমন ভাই আরও অন্যকে আপনার বলি? কেরে আমার আপনার? আমার মা! তুমিই আমার আপনার; ঐ বিশ্বাসজীবীরাই ভাই, বন্ধু, আত্মীয়, কুটুম্ব। হে হরি, আর পুরাতন জীবন যেন বহন করিতে না হয়; পুরাতন জীবন ঘুচাইয়া দাও। দ্বিজ হইয়া বাঁচি। আমি দেখাতে চাই, আর আমি পুরাতন লোক নই; পুরাতন লোক যে, সে মরিয়াছে। আমার বুদ্ধি, বিশ্বাস, আশা আর এক রকমের হইয়াছে। ধর্ম্মচিকিৎসক বলিলেন, আর জ্বর নাই। নূতন জীবনের অনুভব যাহাতে শীঘ্র হয়, এই কয়টি লোকের মাথায় হাত রাখিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর। করস্পর্শ করিব উপাসনার পর, আর বলিব, কোন্ দেশ হইতে আসিলে? নববৃন্দাবন হইতে বুঝি? নবকাশী হইতে আসিলে? তোমার গায়ে যে গোলাপের গন্ধ! এই নূতন সুখে সুখী হোক আমাদের পরিবার। দ্বিজত্বের উৎসব আমাদের হউক। মা মঙ্গলময়ি, আমরা যেন নবজীবনের আনন্দ অনুভব করিতে পারি। মা, তোমার শ্রীপাদপদ্মে পড়িয়া এই প্রার্থনা করি, আর যেন সংসারে মরিতে না হই। নূতন জীবন পাইয়া নববস্ত্র পরিধান করিয়া স্বর্গীয় ভাই বন্ধুদের সঙ্গে যেন মিলিত হইতে পারি, এই আশা করিয়া আমরা তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি।

প্রত্যাদেশ।

রবিবার, ১১ই চৈত্র, ১৮০৪ শক।

আজ কাল কি লোকের প্রত্যাদেশ হয়? পুস্তকের ভিতর দিয়া কথা না কহিয়া গুরু মুখের ভিতর দিয়া উপদেশ প্রদান না করিয়া স্বয়ং ব্রহ্ম এই উনবিংশ শতাব্দীতে ভক্তদের সঙ্গে কি কথোপকথন করেন? ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রত্যাদেশের উদাহরণ কি এত পাওয়া যায়, যে, তদ্দ্বারা প্রত্যাদেশ সাধারণ বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে? তোমার কি এ জীবনে প্রত্যাদেশ হইয়াছে? এ প্রশ্নের পরিষ্কার মীমাংসা করা আবশ্যক। মীমাংসা না হইলে হয় অহঙ্কারী হইয়া পড়িব, নয় কুসংস্কারে আমাদের জীবনতরী চূর্ণ হইয়া যাইবে। যদি ঈশ্বরের দিক হইতে দেখা যায়, তবে পলকের মধ্যেই মীমাংসা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি, কেন না ঈশ্বর দয়ালু, জ্ঞানী ও সর্ব্বশক্তিমান্। এই তিন গুণেতেই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, আগে যদি দয়া করিয়া মনুষ্যমোহ দূর করিবার জন্য তিনি সাধুদিগকে জ্ঞান দান করিয়াছিলেন, দয়া হ্রাস না হইলে আর তাঁহার সে কার্য্য হইতে বিরত হওয়া সম্ভব মনে করি না। জ্ঞানের অভাবে প্রত্যাদেশের লোপ হইতে পারে; এখন যদি প্রত্যাদেশ না হয়, হয়ত মানিতে হইবে, তাঁহার আর তেমন জ্ঞান নাই যে প্রত্যাদেশ করিবেন। বুদ্ধি ও মেধার হয়ত হ্রাস হইয়া থাকিবে। দয়া ও জ্ঞান যদি পূর্ণ থাকে, হয়ত আর তাহার বল নাই। পূর্ব্বে মনে করিলেই চৌদ্দ লক্ষ লোককে প্রত্যাদেশের অগ্নিতে পূর্ণ করিতে পারিতেন, কোটী লোককে পবিত্রতার অগ্নিতে উজ্জ্বল করিতে পারিতেন, উনবিংশ শতাব্দীতে ঈশ্বরের সে ক্ষমতার হয়ত অভাব হইয়াছে। এখন পূর্ণদয়া ও পূর্ণজ্ঞান সত্ত্বেও তিনি প্রত্যাদেশপ্রদানে অসমর্থ। কিন্তু আমরা সকলেই জানিতেছি, যে ভগবান্ সেই ভগবান্; যে জগন্নাথ সেই জগন্নাথ। অভাব কেমন করিয়া হইবে? কালাতিপাতে পূর্ণতার অভাব হয় না। তিনি সৃষ্ট জীব নহেন যে তাঁহার হ্রাস হইবে। গত কল্য তিনি যেমন ছিলেন, অদ্যও তিনি তেমনই, আগামী কল্যও তিনি সমান থাকিবেন। তাঁহার দয়া, জ্ঞান ও শক্তি কখন খর্ব্ব হয় না। যদি তিনি এক সময়ে প্রত্যাদেশের প্রয়োজন বুঝিয়া থাকেন, আজও বুঝিতেছেন; যে অলৌকিক ভাবে

অলৌকিক জ্ঞান প্রদান করিতেন, এখনও সে ভাব আছে ; যে জ্ঞানে আগে তিনি সিদ্ধান্ত করিতেন, এখনও তাঁহার সেই জ্ঞান বর্ত্তমান। তবে ঈশ্বরের দিক্ হইতে ঠিক হইল যে প্রত্যাদেশদানপক্ষে ভগবানের প্রকৃতি ও মনের ভাব ঠিক আছে। ইতিহাস যদি সত্য বলিয়া মান, তবে এখনও মানিতে হইবে যে, জীবের প্রত্যাদেশ হয়। যদি বল কাহারও হয় নাই ; উনিশশতাব্দীকে সে অধিকার হইতে বঞ্চিত বলিয়া প্রচার কর, ক্ষতি নাই। সৌভাগ্য এক দিকে, দুর্ভাগ্য অপর দিকে, নববিধানের পক্ষে এরূপ নির্দ্দেশ করা সাধ্যায়ত্ত নহে। পক্ষপাতী হওয়া কখনই হইতে পারে না। প্রত্যাদেশের সৌভাগ্য ছিল যদি, আছে তবে, থাকিবে তবে। ঈশ্বরের দিক হইতে ত দেখা হইল, এখন মনুষ্যের দিক্ হইতে দেখা উচিত। প্রত্যাদেশ হইলেও গ্রহণের ত্রুটী হইতে পারে। জীবের পক্ষে অক্ষমতা, আলস্য বা অরুচি থাকিতে পারে। সম্পূর্ণরূপে মীমাংসা করিতে হইলে দেখিতে হইবে, প্রত্যাদেশ তবে কি ? ইহা না জানিলেত বলিতে পারি না প্রত্যাদেশ হয় কি না, প্রত্যাদিষ্ট হইতে পারি কি না। আমাদের সকলের জীবনেই দেখা যায়, কতকগুলি বিষয় আসে এবং কতকগুলিকে আমরা আনয়ন করি। কোন অগ্নি আমরা নিজে জ্বালি, আর কোন অগ্নি স্বর্গ হইতে দেখা দেয়। পূর্ণিমার চন্দ্র আপনি আসিয়া বাড়ী আলো করিল, আর রংমশাল জ্বালিয়া আমরা বাড়ী আলো করিলাম। কোন লেখা আপনি লিখিত হয়, আর কোন লেখা মানুষে লেখে। কোন সময় কলম ধরিলাম, আমার মন কোথায় রহিয়াছে, কে কলম চালাইল, কি সুন্দর লেখা হইল, বুঝিতে পারি না ; কলম আপনিই চলিতে লাগিল। আর এক সময় আমি নিজে কলমকে চালাই ; মস্তিষ্ককে বিক্ষিপ্ত হইতে দিই না, মনঃপবনকে স্থির করিয়া চিন্তাপথে নিয়োগ করি, গম্য স্থানে আস্তে আস্তে যাই। কার বাড়ী যাইব, কোন্ পথে যাইতে হইবে, সে বিষয়ে বিলক্ষণ জ্ঞান আছে। ক মিনিটে যাওয়া যায় তাহারও নির্দ্ধারণ করা আছে। জ্ঞানমার্গে চলিলাম, বুদ্ধি ঠিক আছে। কখনও পায়ে পড়িয়া প্রার্থনা করিলাম, পাপ ছাড়িবার জন্য ; পুস্তকাদি পড়িয়া, সাধু সঙ্গ করিয়া, দুরন্ত রিপুকে দমন করিলাম, আর কোন সময় বা সিদ্ধি আপনি সিদ্ধ হইল। কিছুই

যেমন পড়ে, মেঘের ভিতর দিয়া,—সিদ্ধি কখনও কখনও সেইরূপে সমাগত হয়। এই ক্রোধ আসিল, পর ক্ষণে দেখি, দুর্গা যেমন আশ্বিন মাসের মূর্ত্তিতে, তেমনই আত্মা দাঁড়াইল মহাসুরের বক্ষে। কার কাছে অস্ত্র লইয়াছিলাম, কিরূপে ধারণ করিলাম, কি প্রকারে নিক্ষেপ করিলাম, কত ক্ষণ পাপের সহিত সংগ্রাম হইল, কোন্ দিক্ হইতে আক্রমণ করা হইয়াছিল, কিছুই জানি না। মূর্চ্ছাভঙ্গ আর জয়লাভ। কেহ একটি গান করিল, গানের সময় সুর ভাঁজিল, ছাদে গেল, পুষ্করিণীর ধারে গেল, গাড়ী করিয়া জ্যোৎস্না রাত্রে গঙ্গাতীরে গমন করিল, তখনও হইল না; শেষ রাত্রে গলাজলে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতে লাগিল; অনেক পরে গুরু উপদেশে গান বাহির হইল। গানগুলিতে শব্দের লালিত্য পাঁচ খানা পুস্তক হইতে ধার করিয়া লওয়া হইল। পরের বাগানের ফল চুরী যেমন, এক এক কবির নিকট হইতে কবিতা চুরী তেমনই। সম্পত্তি তাঁদের, সাজান আমার। নিজ বুদ্ধিতে উৎকৃষ্টতম ছন্দে সংগীতটিকে আবদ্ধ করিয়া শব্দলালিত্য ও ছন্দের মাধুর্য্য দুই মিলাইয়া গঙ্গাজলে গলাজল হইয়া অনেক কষ্টে আশ্চর্য্য গান গাইলাম। সে জন্য কত ক্ষমতা ও আয়াস লাগিল, তবে সিদ্ধ হইল। আর এক সময় গল্প করিতেছি, মনে হইল একটি গান হইলে মন বড় সুখী হয়। কিছুই জানি না, হঠাৎ মধুর সুর গলা হইতে বাহির হইল, প্রাণ মোহিত হইয়া গেল। কণ্ঠ কেবল সুরই বিনির্গত করিতেছে। সরস্বতী যেন নিজে আসিয়া ছন্দ শিখাইলেন। বেদ বেদান্ত হইতে গম্ভীর শব্দ সকল আপনাপনি সঙ্কলিত হইয়া সিদ্ধ রসনাতে আসিল। কে শিখাইল, বুঝিলাম না। সরস্বতীপ্রসাদে স্বয়ং সিদ্ধ, অনায়াসসিদ্ধ, যে কথাই বল, সহজে মধুর গানে সক্ষম হইলাম। কে বা বিদ্যার পথে চলে গানে নিপুণ হয়, কে বা ধর্ম্মে সুসিদ্ধ হয়, বোঝা যায় না। কতক চলে, আর কতককে দেবতা চালান। কেহ কেহ রসনাকে চালায়, বীণাপাণির হস্তে কেহ কেহ রসনা ও প্রাণকে অর্পণ করে। বীণাপাণি স্বয়ং বাজাইতে থাকেন, যন্ত্র তাঁর হস্তের হয়। এইখানে প্রত্যাদেশ। যেখানে লোকে সাঁতার দেয়, প্রত্যাদেশ সেখানে লুপ্ত; ভাসে যেখানে স্রোতে, যেখানে জীবের শরীরকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, সেইখানে প্রত্যাদেশ। যেখানে মানুষ আপনি

আগুন জ্বালিয়া গৃহকে আলোকিত করে, সেখানে প্রত্যাদেশ নাই; যেখানে স্বর্গের চন্দ্র মনুষ্যকে আলো দেয়, সেইখানে প্রত্যাদেশ। যেখানে ধর্ম্ম-সাধন করিয়া পাপ জয় করিতে হয়, সেখানে প্রত্যাদেশ নাই; আর যেখানে সহস্র সহস্র দেবতা আসিয়া এক জন হইয়া অসুর বিনাশ করেন, মানুষ বিস্মিত হয়, সেইখানে প্রত্যাদেশ। সকল কার্য্যেই এই দুই প্রণালী আছে; সকল মানুষের মধ্যেই এই দুই প্রণালী দেখিতে পাই। প্রত্যা-দেশ ও জীববুদ্ধি সকলেতেই কার্য্য করে। সহজে সিদ্ধ আর আয়াস সিদ্ধ, দেবপ্রসাদে লব্ধ ও মনুষ্যলব্ধ সর্ব্বত্রই দেখা যায়। যদি মন্দিরের কেহ মনে করেন, আমার ইহার কোন একটি নাই, তিনি হয় অল্প বিশ্বাসী, নয় বড় সত্যবাদী নহেন। যিনি বলেন, ঈশ্বর আমাকে কখনও প্রত্যাদেশ করেন নাই, তাঁহার যে কেবল পাপ জীবন তাহা নয়, রসনাও তাঁহার মিথ্যা কথা কহিতেছে। যেরূপ বলা হইল, এই যদি প্রত্যাদেশ হয়, তাহা হইলে সত্যানুরোধে এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রত্যেকেরই প্রত্যাদেশ হইয়া থাকে। কে বলিতে পারেন, কখনও প্রত্যাদেশ হয় নাই? যদি কখনও গান বাঁধিয়া থাক, এক দিন কি সহজে বাঁধ নাই, আর এক দিন কি আয়াস সহকারে বাঁধ নাই? যদি পাপ দমন করিয়া থাক, কোন সময় কি সহজে দমন কর নাই, আর কোন সময় কি যত্ন চেষ্টা করিয়া তাহা করিতে হয় নাই? একটি পদ্যরচনা বা গদ্যরচনা কি সহজে কর নাই, আর একটির সময় কি আয়াস আবশ্যক হয় নাই? এমন বক্তৃতা কি কর নাই, যখন শব্দ তোমাকে ফেলিয়া দৌড়িয়াছে; আর এমন বক্তৃতাও কি কখনও করিতে হয় নাই, যখন তুমি শব্দকে খুঁজিয়া পাও নাই। কখন বক্তৃতা করিবার সময় বাড়ীতে চেষ্টা করিলাম না, অথচ দেখিলাম, রেলের গাড়ী যেমন দৌড়ায় তেমনই শব্দ সকল দৌড়িতে লাগিল; আকাশে তাড়িত যেমন ছোটে কথা সকল তেমনই ছুটিতে লাগিল; ভাব সকল আপনাপনি দৌড়িতে আরম্ভ করিল। আর কখনও বা অনেক ক্ষণ বাড়ীতে বসিয়া বক্তৃতা রচনা করিতে হয়, ভাবিতে হয়। বাস্তবিক এ সত্য খণ্ডন করিতে কোনও ব্যক্তির সাধ্য নাই। প্রত্যেকের হাত ধরিয়া আমি বলিতে পারি, নিশ্চয় তোমারই জীবনে এ প্রকার প্রত্যাদেশের ব্যাপার হইয়াছে।

পাঁচটি বার রাগ দমন করিতে অনেক আয়াস লাগিয়াছে, কেন মিথ্যা বলিব যে, তখনও আমার প্রত্যাদেশ হইয়াছে। পাঁচটি বক্তৃতা নিজে করিয়া কেন মিথ্যা বলিব? বস্তুতঃ তখন আমার প্রত্যাদেশ হয় নাই। কিন্তু কোন সময় হরি তোমারও ভিতর উপস্থিত হইয়া বুদ্ধি প্রেরণ করিয়া প্রত্যাদিষ্ট করিয়াছেন। অভাগা নর আমি; আমারও ঈশা মুষার ন্যায় প্রত্যাদেশ হইল এই ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। মুষার নিকট ঝোপের মধ্য দিয়া যেমন অগ্নি জলিয়াছিল, তোমার নিকটেও তাহা হইল। কখনও আপনি পথ দেখিয়া লইয়াছ, কখনও চন্দ্রালোক, স্বর্গীয় আলোক তোমাকে পথ দেখাইয়া দিয়াছে। কোন না কোন অবস্থায় নিশ্চয়ই প্রত্যাদেশ হইয়াছে। লক্ষ লোকের মধ্যে কেহই অবশিষ্ট থাকিবে না। যখন অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিব, দেখিব সকলেরই জীবন প্রত্যাদেশ পাইয়াছে। কেহ একটি, কেহ এক মাসে একটি, কেহ এক বৎসরে একটি, কেহ বা সমস্ত জীবনে প্রত্যাদেশ পাইয়াছে। সময়ের অনুকূলতায় প্রত্যাদেশের বৃদ্ধি ও হ্রাস হয়, এ কথা মানিতে পারি, কিন্তু এ কথা কখনই মানিব না যে, প্রত্যাদেশ অসম্ভব। যখন মানি মহাকবি কালীদাসও প্রত্যাদিষ্ট, সেক্সপীয়র প্রত্যাদেশ বলে কবিত্বে সিদ্ধ; তখন ইহাও মানিব, যে সকল ব্যক্তি আপন চেষ্টায় নয়, কিন্তু ব্রহ্মকৃপায় কবি হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেই প্রত্যাদেশ আছে। সামান্য সাহিত্যে যখন এত প্রত্যাদেশ, স্বর্গীয় সাহিত্যে কেন প্রত্যাদেশ হইবে না? গানেও প্রত্যাদেশ আছে। গান শুনিয়া বুঝিতে পারা যায়, ভগবানের কৃপায় এ গান হইতেছে। বক্তৃতা শুনিয়া বুঝিতে পারা যায়, এ ব্যক্তি পুস্তকাদি পড়িয়া বক্তৃতা করে নাই; উপার্জ্জিত জ্ঞানে কৃতবিদ্য হয় নাই; মাতৃগর্ভ হইতে জ্ঞান, শক্তি লইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। ঝড়ের সময় এই নৌকা ভাঙ্গিয়া গেল, অল্পক্ষণের মধ্যে শান্তি উপকূলে উপনীত হইলাম; এইখানে প্রত্যাদেশ। গুরু দশ বৎসর চেষ্টা করিয়া রাগ থামাইতে পারিলেন না; পরিবারের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইল, সেই ঘটনাতেই একেবারে রাগ চলিয়া গেল। এমনই প্রত্যাদেশ আসিল যে, মানুষকে পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিল। অতএব সকলে সতর্ক হইয়া প্রত্যাদেশ প্রতীক্ষা করিবে। কাহার নিকট কখন প্রত্যাদেশ আসিবে, কেহ বলিতে

পারে না। মন্দ অবস্থায়, পাপের অবস্থায় যে প্রত্যাদেশ আসিবে না, ইহাও সত্য নহে। শল যিনি পল হইয়াছিলেন, শল অবস্থাতেই তিনি প্রত্যাদেশ পাইয়াছিলেন, নতুবা কেমন করিয়া পল হইলেন? জগাই মাধাই পাপের ভিতর থাকিয়াই প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিলেন। হীনবুদ্ধি অভাগা বলিয়া আপনাদিগকে প্রত্যাদেশবঞ্চিত মনে করিবে না। প্রাতঃকালে কখনও; রাত্রিতে কখনও; সম্পদে কখনও; বিপদে কখনও; সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই প্রত্যাদেশ আসিতে পারে। উপাসনা যখন খুব করিতেছ, সে অবস্থায় কখনও প্রত্যাদেশ হইবে, ছয় মাস যদি উপাসনা না থাকে, সে অবস্থাতেও কখনও প্রত্যাদেশ হইবে। মদ ছাড়িয়াছ যখন, তখন প্রত্যাদেশ পাইতে পার, আর মদ খাইতেছ, তখনও প্রত্যাদেশ সম্ভব। শুঁড়ির দোকান হইতে মদ খাইয়া বাহির হইল, প্রত্যাদেশ আসিয়া হঠাৎ সেই ব্যক্তিকে স্বর্গের দ্বারে লইয়া গেল। পুণ্যের অবস্থায় কখন, পাপের অবস্থায় কখনও প্রত্যাদেশ আসিবে। অলৌকিক ব্যাপার! বিশ্বাসের ব্যাপার! প্রত্যাদেশ হইলে আর কি পৃথিবীকে পৃথিবী মনে হয়? সিংহ ব্যাঘ্র ভয় দেখাইতে পারে না; হিমালয় কোথায় থাকে, প্রত্যাদেশ আসিলে! প্রত্যাদেশের আগুন যখন জ্বলে তখন কে বাধা দেয়? কোটী শত্রু যদি বাধা দেয়, প্রত্যাদিষ্ট সন্তান কেবল হাসিতে থাকেন। ব্রহ্মভাব, ব্রহ্মতেজ প্রত্যাদেশের অবস্থায় জীব শরীরে সমাগত হয়। স্বর্গীয় কপোতের আবির্ভাবে নরহরির মিলন দেখিতে পাওয়া যায়। চক্ষু কর্ণ হইতে, হস্ত পদ হইতে আগুন বাহির হইতে থাকে। প্রত্যাদেশ হইলে সমস্ত শরীর অগ্নিময় হয়। নববিধানবাদী প্রত্যাদেশের কাহিনী শুনিয়া প্রতীক্ষা করুন, কখন প্রত্যাদেশ আসিয়া জীবনতরীকে শান্তিরাজ্যে লইয়া যায়।

হে দীনবন্ধু, হে প্রত্যাদিষ্টদের এক মাত্র সদ্‌গুরু, তোমার কৃপাতে আমরা ধর্ম্মেতে সুসিদ্ধ হইব, পৃথিবীতে থাকিয়াই স্বর্গের আস্বাদন পাইব; এই আশা করিয়াছি। ইহা কেবল প্রত্যাদেশের অবস্থাতেই হইবে। নিজের চেষ্টায় যে ধর্ম্ম, উপাসনা করি, তাহাতে অহঙ্কার হইতে পারে; সেটুকু সার মনে হয় না; অধিক মূল্যের মনে করিতে পারি না। সাধুদের

জীবনের কথা শুনিয়াছি, কেমন অনায়াসে তাঁহারা সিদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই সাধু সন্তান বলিলেন, "পাপ দূর হ" অমনই পাপ চলিয়া গেল।" আর আমরা পাপ তাড়াইবার জন্য এত কাঁদিতেছি, তবু পাপ যায় না। আমরা ত সেই বংশের সন্তান; আমাদের কেন তেমন হয় না? এক হুঙ্কারে আমরা পাপকে তাড়াইয়া দিব। এখন যে কথা শুনিলাম, এ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা প্রত্যেকেই যে প্রত্যাদেশ পাইয়াছি। পাইয়াও প্রত্যাদেশে অবিশ্বাস করিয়াছি। তোমার প্রত্যক্ষ কৃপায় যখন পাপ দমন করিয়াছি, তখনও বলিয়াছি আমি করিলাম। দেখ হে ভগবান্, যাহারা প্রত্যাদেশ পাইল না, তাহারা কত দুর্ভাগা; আর যাহারা প্রত্যাদেশ পাইয়াও মানিল না, তাহারা আরও দুর্ভাগা। প্রত্যাদিষ্ট জীবের রক্তে দেবতারা সঞ্চারিত। সে অবস্থায় যে সুখ সর্ষপকণা পরিমাণে যদি তাহা আমাদিগকে দান কর, কৃতার্থ হইয়া যাই। এই দলটি তোমার অনেক দিনের আশ্রিত; শুনিলাম, প্রত্যেকের জীবনেই প্রত্যাদেশ হইয়াছে। বন্ধুরা মানিলেন না; ভাইএরা মানিলেন না। যদি মানিতেন, আরও কত প্রত্যাদেশ হইত। না মানিয়া আর পাইলেন না। নূতন বাইবেল প্রস্তুত হইত, তাহা আরম্ভ হইতেছে না। প্রত্যাদেশ! প্রত্যাদেশ! কপোতরূপে আবার এস; বুদ্ধির অভি-মানে পৃথিবী গেল; আবার আসিয়া লোকের চিত্ত আকর্ষণ কর। নিদ্রিত ভগবান্, অচেতন ভগবান্, সমুদ্রে ভাসিতেছেন, থাকিলেই বা কি না থাকিলেই বা কি? যিনি অন্ধকে চক্ষু, বধিরকে কর্ণ দেন, আমরা সেই ভগবান্‌কে মানি। হে প্রজ্জ্বলিত হুতাশন, দর্শন দাও, দর্শন দাও। উড়িব প্রত্যাদেশের আকাশে। ধর্ম্মবিজয় হইবে। হে ঈশ্বর, হে জগতের সিদ্ধিদাতা, মুক্তি দাতা, আর এক বার তোমার আশ্রিত জীবকে উদ্ধার কর। রসনার ভিতর প্রত্যাদেশের অগ্নি দাও; জীবনবেদ হইতে এক এক অধ্যায় বাহির করিয়া দেখাইব। নববিধানের পূজা জ্বলন্ত ভাবে আরম্ভ করিব। প্রত্যাদেশের ঝড় তুলিয়া ব্রাহ্মসমাজকে আলোড়িত আন্দোলিত কর। বালক যুবা বৃদ্ধ সকলে ক্ষেপিয়া উঠুক। পাগলবংশ দেখাও; মত্ত হস্তির ন্যায় যে সকল লোক, সেই সকল লোককে দেখাও; একবার বঙ্গদেশকে মাতাইব। জল হইব না; আমরা অগ্নি হইব। বুদ্ধির কুমন্ত্রণা ত্যাগ করিয়া প্রত্যাদে-

শের আকারে যথার্থ বেদজ্ঞান লাভ করিব। আশীর্ব্বাদ কর, যাহাতে প্রত্যাদেশের তেজ ও জ্যোতিঃ লাভ করিয়া নববিধানকে জীবনে প্রকাশ করিতে পারি। হে সিদ্ধদাতা, বিনীত ভাবে প্রণত হইয়া প্রত্যাদেশের চরণ ধরিয়া পড়িয়া থাকিব। স্বর্গের বলে বলীয়ান্ হইয়া জ্বলন্ত রাজ্য পৃথিবীতে স্থাপন করিব, এই আশা করিয়া ভক্তির সহিত তোমার শ্রীপাদপদ্মে বার বার প্রাণাম করি।

নববিধানে কৈলাস আবিষ্কার।

হিমালয়স্থ সিমলা শিখরে জগতের প্রতি স্বর্গগত আচার্য্যের শেষ উক্তি।

ভাদ্রোৎসব, ১৮০৫ শক।

কলি জিজ্ঞাসা করিলেন নববিধানকে, আর্য্য, যে মহাদেবের কথা শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে সে মহাদেব কোথায় গেলেন? পৃথিবী দুঃখে বিলাপ করিতেছে। না রাজা সুখী, না প্রজা সুখী। না জ্ঞানীর মনে আনন্দ না মূর্খের মনে সুখ। অন্ধকার আছন্ন করেছে পৃথিবীর মুখ। মহাদেব কোথায় আছেন? দেবদেব মহাদেব কি কলির পাপ ও দুরাচার দেখিয়া তাঁহার সৃষ্টি ভুলিয়া অন্ধকার স্থানে লুকাইয়া আছেন? তিনি কি মনুষ্যের পাপে বিরক্ত হইয়া তাকে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন? কলি বলিল, আমার জ্ঞানীরা মহাদেবকে কিছুতেই দেখিতে পাইল না; আমার সভ্যতার আলোক মহাদেবদর্শনে সক্ষম করে না। কলির দুর্দশা কেন এমন হইল, এই ভেবে আমি কাঁদি। ঋষিগণ পূর্ব্বে ব্রহ্মে আত্মা সমাধান করিতেন। হে শ্রীনববিধান, কৃপা করিয়া মহাদেবের পথ প্রকাশ কর। কোথায় মহাদেব? এই গভীর প্রশ্নের উত্তর কেবল নববিধান দিতে পারেন। বিধাতা পথিকদিগকে তীর্থ যাত্রায় আনয়ন করিলেন। এক জনকে এ পর্ব্বতে, আর এক জনকে ও পর্ব্বতে বসাইলেন। নব মন্ত্র উচ্চারিত হইল; নব নদী প্রবাহিত হইল; নব সূর্য্য উঠিল। আকাশে ও পৃথিবীতে নব বিধানের নব আলোক দেখা গেল। অন্ধ দেখিতে পাইল না, দিব্যনয়নে ভক্ত তাহা দেখিলেন। নববিধান সেই তত্ত্ব আমা-

দিগকে শিখাইয়াছেন। হে বন্ধুগণ, আমি সেই তত্ত্ব বিষয় তোমাদিগকে বলি, তোমরা শোনো।

মহাদেব এক জন সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি সতী, দুয়েতে মিলিত। তিনি যোগেশ্বর আর প্রকৃতি দেবী যোগেশ্বরী। মহাদেব থাকিতে পারেন না সতী ছাড়া. সতী থাকিতে পারেন না দেবক্রোড় ভিন্ন। কিন্তু কি ভয়ানক। দুই পাশে দুই বিকটকার প্রেত। এ কি? কোথায় এমন সুন্দর দৃশ্য দেখে মনে ভক্তির উল্লাস হবে, কোথায় সতীপতি-দর্শনে মনে প্রেমের সঞ্চার হবে, না দ্বারী দেখেই প্রাণ ভয়ে আকুল! তবে কি ধর্ম্মপথ ভয়ে পূর্ণ। মহাদেবের দ্বারী হলেন মৃত্যু। সেই ভয়ঙ্করমূর্ত্তি-বিশিষ্ট মৃত্যু দেখিয়া কলির মনে হইল, এক বার যদি মৃত্যু দর্শন না হয় তবে মহাদেবের দর্শন কিছুতেই হইবে না। আগে ছাড় পৃথিবীর লালসা কামনা, তবে পূর্ণমনোরথ হইয়া মহাদেবের সদনে উপস্থিত হইবে। জান না কি যে মহাদেব আপনার কাছে সমস্ত পৃথিবীর সুখ রাখিয়া দিয়াছেন? তবে কৈলাস খুঁজিতেছ কেন? ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান কর, আপনার কামনা লালসা পরিবর্জ্জন করিয়া হিমালয়ে দাঁড়াও। কৈলাসে মহাদেবের বাস; অথচ আমরা সেই স্থানে আসিয়া ঘুরিতেছি। যাঁহারা মৃত্যু অপেক্ষা জীবন ভাল বাসিলেন তাঁহাদের কিছু হইল না। হা কৈলাস, মহাদেব ও মহাদেবীর আবাস স্থান, এই যে তোমাকে আমরা খুঁজিতে আসিয়াছি। সমুদায় হিমালয় ক্রমে ক্রমে অনুসন্ধানের বিষয় হইল। সকলেই দেখিল সেই ধবলাগিরি, সেই নির্ঝরিণী, সেই হ্রদ, সমস্তই দেখিল। কিন্তু জীব কাঁদিল, বলিল মহাদেব কৈ? আমরা এখন ইহা বুঝিয়াছি ও সেই রহস্য কথা সাহস পূর্ব্বক পৃথিবীকে বলিতে পারি। মহাদেব এই পাহাড়ে আছেন, এই স্থানে তিনি বসিয়া আছেন। কিন্তু সমস্ত দ্বার অবরুদ্ধ; কে যেন অবিশ্বাসের অন্ধকার দিয়া সকল ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। আমরা কি কৈলাসের সমাচার না লইয়া, নিরাশ হইয়া, কলিকাতায় ফিরিব? আমরা কৈলাসের সুসমাচার কলিকাতায় বলিব, আমরা বেদবেদান্তের গভীর সত্যের সাক্ষী হইব, এই জন্য তীর্থ ভ্রমণে আসিয়াছি। ঈশ্বর ধন্য! ঘোর কলির অন্ধকার মধ্যে তিনি যে অন্ততঃ কয়েক জন ভক্তের হস্তে কৈলাসের চাবি দিলেন,

ইহা কলির পক্ষে বড় সামান্য অনুগ্রহ নহে। সাধন না করিলে কিরূপে সেই ব্রহ্মবস্তু লাভ হইবে? আমরাতো সেই পবিত্র হিমালয়ের কাছে শরণাপন্ন হইয়াছি। এখন কি আমরা কাঁদিয়া বাড়ী ফিরিব? শুনিয়াছি এই যক্ষ পর্ব্বতে কুবেরের অনন্ত রত্নরাশি ছিল, এই সকল পাহাড়ে তাঁহার রাজ্য ছিল। আমরা হিন্দুজাতীয় পুরাণ কথা কেন অগ্রাহ্য করিব? এই স্থানেই সমুদায় দেবতাদিগের আবাস স্থান। উচ্চ গভীর চিন্তার স্থান এই হিমালয়। সুতরাং যিনি যোগেশ্বর মহাদেব তিনি এ স্থান ছেড়ে কেন অন্য স্থানে আবাস স্থাপন করিবেন। তাই বলি তোমরা এবার কৈলাস না দেখিয়া কলিকাতায় ফিরিও না। তাহা হইলে তোমাদের স্ত্রী, পুত্র, বধূ সকলে তোমাদিগকে ধিক্কার করিয়া বলিবে দেবীর বাড়ীর কাছে গেলে, মহাদেবের মন্দিরের কাছে দিয়া প্রত্যহ আফিসে যাইতে, আর তাঁহাদের কোন সংবাদ আনিতে পারিলে না। গেলে তীর্থ স্থানে আর দেবীকে না দেখে শূন্য মনে ফিরে এলে? ধিক্ ধিক্ সংসারী। তোমরা সিমলা পর্ব্বতে গেলে যেখানে মহাদেব বাস করেন, দেবদেব মহাদেবের রাজ্য থেকে আমাদের জন্য কিছু রত্ন আনিতে পারিলে না; ধিক্ ধিক্ তোমাদের। সত্য কথা যেখানে একটি বার দেব বলিবামাত্র কোটি পর্ব্বত দেবদেব মহেশ্বর বলিয়া ঝঙ্কার করিয়া উঠে; যেখানকার সূর্য্য সুবর্ণ, চন্দ্রও সুবর্ণ, সেইখানে আমরা বসিয়া আছি। যদি হিন্দু গৌরব রক্ষা করিতে ইচ্ছা থাকে তবে ভাই এস, হাত ধরে লইয়া যাই। এই দেখ পূর্ব্ব, ঐ পশ্চিম, ঐ উত্তর, ঐ দক্ষিণ। দেখ সারি সারি গিরিশ্রেণী অনন্ত অসংখ্য অগণ্য গিরিশিখর। কিন্তু কেবলই পাথর। পাথর কি মহাদেব? না! পাথরে মহাদেব। মহাদেব পাথর চাপা। পাথর কি মহাদেব দেখাইতে পারে? তবে একতারা লইয়া বাজাইব, যোগতীর মারিয়া এই সমস্ত পাথর দ্বিধা করিয়া ফেলিব। অদ্যকার উৎসব ভারতের নিকট, পৃথিবীর নিকট প্রচার করুক যে কৈলাস আবিষ্কৃত হইল। মহাদেব বৈরাগী হইয়া ভিক্ষা করিতেছেন, প্রকৃতিকে ক্রোড়ে লইয়াছেন। যেমন পাথর খানি খুলিল আর সোণার ঘরে দেবদেবীর যুগল মূর্ত্তি প্রকাশ হইল। যতই পর্ব্বতের লক্ষণ পুস্তকে অধ্যয়ন করি, ততই এই কথা সপ্র-

মাণ হয়। পর্ব্বতের ভিতরে পার্ব্বতী শক্তি, গিরিজ্যোতি। এখানে যেমন বাতাস, এখানকার যেমন সুন্দর ফুল, এখানকার যেমন সুন্দর চাঁদ, এমন আর কোথায় আছে? এখানকার নির্ঝরের যেমন শব্দ ইহার তুলনা কি আর কোথাও পাওয়া যায়? মহাদেব, তোমার স্ত্রী প্রকৃতি যথার্থই এখানে বাস করেন। হে সম্মুখস্থ ফুল, হে কুসুম শোভা, তোমরা কোথা হইতে এমন লাবণ্য পাইলে? এমন কোমলতা এ পাথর হইতে কে বাহির করিল? নির্ঝরের পার্শ্বে যখন তোমাদের মনোহর লাবণ্য বিকাশ কর ত হা দেখিয়া মন প্রাণ বিভুচরণের দিকে আপনাপনিই ধাবিত হয়। প্রকৃতি দেবী কেমন আস্তে আস্তে নির্ঝরিণী তীরে বীণা বাজাইতেছেন। কেমন ফুল গুলিকে মালা গেঁথে রেখেছেন। কেন না তাঁহার ভক্তেরা এসে গলায় পরিবে। মা প্রকৃতী দেবী, যথার্থই তুমি এ স্থানে বিরাজ করিতেছ। তোমার শ্রীপদে সহস্র সহস্র নমস্কার।

প্রকৃতির পাশে সেই বৈরাগী মহাদেব বসিয়া আছেন। সভ্যতা ধিক্কার করে বলে এত বড় রাজা ঝুলি কাঁধে করে ভিক্ষা করিতেছেন। বাস্তবিক পৃথিবীর কল্যাণের জন্য যদি কেহ বৈরাগী হইয়া থাকেন তো তিনি মহাদেব। মহাদেব কেবল অষ্ট প্রহর বলিতেছেন, জীব, তোদের কল্যাণ হউক্! ছেলে হবে সুখী এই জন্য পিতা হলেন ভিখারী। এক্ষেতে না বাসনা, না কামনা। তিনি পরিচ্ছদ বা ধন বা ধানের প্রয়াসী নহেন। তিনি তো সর্ব্বত্যাগী, আবার আপনাকেও ত্যাগ করিলেন। ভক্তকে বলেন "তুই কি মনে করেছিস্ আমি আমার ভক্তকে কেবলই বিশ্ব দিই। আমিও যে ভক্তেরই। আমার টাকা কড়ি সমুদায় আমার ভক্তেরই উপর লিখিয়া দিই। সমস্ত দিলাম। কেবল শেষে বাকি রহিলাম আমি, আমাকেও তুই নে। তোর কাছে থাকিব আমি। তোর যখন যাহা দরকার হবে আমি তাহা আনিয়া দিব। তোর যখন হবে রোগ শোক তখন তোর কাছে বসে গায়ে হাত বুলাইব। আমি তোর সর্ব্বাপেক্ষা আত্মীয় হয়ে রহিলাম। তোর কাছে সেবকের মত দিন রাত্রি হাজির রহিলাম। যখন আমার মহাদেব কৈ? বলিয়া ডাক্‌বি, তখনই তোর কাছে আস্‌ব। কেন না ভক্ত আমার বড় আদরের ধন। পাঁচ জন

ভক্তকে দেখিলেই আমি সুখী হই। আমি মেঘকে বলেছি আমার ভক্তের ক্ষেত্রে বৃষ্টি করিতে; ফুলকে বলেছি ভক্তের গলার মালা হয়ে ঝুলিতে; চাঁদকে বলেছি ভক্তের মাথায় সুন্দর জ্যোৎস্না দিতে, আর সূর্য্যকে বলেছি ভক্তের ঘরে আলোক দিতে।" আহা কি সুমিষ্ট কথা। কি চমৎকার প্রেম! এক দিকে সর্ব্বত্যাগী ব্রহ্ম আর এক দিকে প্রকৃতির সমস্ত ধন ও রত্ন। আহা দেখ দেখ আমরা যে শ্মশান দেখিয়া ভয় পাইতাম তাহারই ভিতর কেমন লাবণ্য, কেমন সৌন্দর্য্য! আমরা আজ এই উৎসবে মহাদেব মহাদেবীর বিবাহ দিই। এসতো দেবদেবী! একবার তোমাদের দুই হাত এক করতো। দাও, দেব, তোমার হস্ত; দাও, দেবী, তোমার হস্ত। আজ আর সিমলা, তুমি আমাদের কার্য্যালয়ের সিমলা হইলে না। আজ তোমাকে সুন্দর দেখিলাম। নব বিধানে দেব ও দেবীর বিবাহ দেখিলাম। বৈরাগ্য হাসেন প্রকৃতির মুখ দেখে, আর প্রকৃতি হাসেন মহাদেবের মুখ পানে চেয়ে। আমরা চিরকাল মহাদেবভক্ত। বুঝিলাম এই সমুদায় হিমালয়ে কৈলাস ছড়াছড়ি। আমার মা প্রকৃতী দেবী, আমার পিতা পরব্রহ্ম মহাদেব, এখানে ওখানে চারি দিকে রহিয়াছেন। কৈলাস এবার চতুর ভক্তের হাতে পড়েছে। কলিকাতা হইতে এক দল চতুর ভক্ত এসেছে। তোমাকে এবার লজ্জা দেব। বড় চারি হাজার বৎসর লুকাইয়াছিলে। সকলকে জিজ্ঞাসা করিলাম কৈলাস কোথায়? কাশ্মীরে, না সিমলায়? সকলেই বলে লাল পানি দেখিলাম, খদে গেলাম কৈ কৈলাসতো দেখিলাম না। দার্জ্জিলিঙ্গে গেলাম, নৈনীতালে গেলাম কৈলাসতো কোথাও দেখিতে পাইলাম না। তবে কি কলিতে কৈলাস কর্পূরের ন্যায় উপে গেল? ওহে হিমালয়, আর কৈলাসকে লুকাইয়া রাখিতে পারিবে না। আমরা যোগের আলো লইয়া সমস্ত পাহাড় রাত্রিতে ও দিনেতে অনুসন্ধান করিলাম। কত খুঁজিলাম মহাদেবের ঠিকানা পাইলাম না। স্ত্রীকে নাকি পতির কথা জিজ্ঞাসা করিলে স্ত্রী কোন না কোন প্রকারে বলিয়া ফেলেন। বৃক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ফুলকে জিজ্ঞাসা করিলাম মহাদেব কোথায়? প্রকৃতি হাসিলেন। যেমন হাসিলেন আমি অমনি তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিলাম! শুনিয়াছি

মেয়ে মানুষের মনে কথা চাপা থাকে না। বল মা তোমার বাড়ী কোথায়? অন্নপূর্ণা, ৪ হাজার বৎসর হইল ভারত কিছু খায় নাই। ভারতের কান্না শুনিয়া মা আর থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন, "পিতা পিতা বলিয়া কত লোকে ডাকিয়াছে কিন্তু পিতাতো অগ্রে আসেন না। তোরা তাই জেনে বুঝি কলিকাতায় বসিয়া মা, মা বলে অত ডাক্‌তিস্? তোরা নববিধানের ভক্ত। আমি তখনই ভাবিয়াছিলাম যে যদি এই চোর ডাকাতের দল এক বার হিমালয়ে আসে তা হলে কোন দেবতার ঘর আর লুকান থাকিবে না।" সকল দেবতাই জানেন যে চতুর ভক্তের মত প্রাণ কেড়ে নিতে আর কেহ পারে না। প্রকৃতি বলিলেন, "ঐ দেখ, ঐ দেখ হিমালয়ের দ্বার খুলিয়াছে। ঐ দেখ আলোকের দ্বার। ঐ যে সতীপতি বসিয়া আছেন। ঐ দেখ কেমন আমি মহাদেবপাশে বসিয়া হাসিতেছি। কিন্তু মহাদেবের মুখে গাম্ভীর্য্য! আমরা দুইটি নই কিন্তু একটি। আমাদের যেখানে পূজা হয়, আমাদের ছেলেদের সেখানে লইয়া যাইব। আমাদের প্রতিজ্ঞা যে, যে বাড়ীতে যাব ছেলেগুলিরে সাজাইয়া সঙ্গে লইব। বৎসরকার দিন দুঃখী ভারতবাসীদের কাছে আমাদের পরিবারটিকে সাজিয়ে লয়ে যাই। কিন্তু এত দিন আমাদের বাড়ী কেউ দেখ্‌তে পায় নাই। ওরে এত দিন পরে আমাদের ঘর বাড়ী লুকানতো রহিল না। সমস্ত ছেড়ে দিয়ে পাহাড় আশ্রয় কর্‌লাম। উচ্চ হইতে উচ্চতর গিরিতে গেলাম, এখানেও এল। যাক্ বলিতে তবে আমাদের প্রেমের হার হইল। এখন হইতে প্রকৃতি ও মহাদেব যেখানে বসিয়া কথা কহিবেন সেখানে ভক্তগণ একেবারে যাইয়া রহস্য কথা শুনিবে।" হে বন্ধুগণ, তোমাদের আমরা বিনীত ভাবে বলিতেছি, সহজে পাথরের মধ্যে পাথর চাপা ব্রহ্ম আমাদের লইলেন, তোমাদেরও হইবেন। তোমাদের পায় পড়ি তোমরা একবার সাধন আরম্ভ কর। নববিধানের সুপ্রভাত হইল। দেবীর কথা শুনিলে। এইবার আনন্দ মনে সপরিবারে তাঁহার অন্তঃপুরে প্রবেশ কর। আর গুরুর দরকার নাই।

হে দীন দয়াল, হে ভারত সন্তানদিগের একমাত্র আশা ভরসা, প্রাচীন ভারতের অনেক গৌরব ছিল। তখন কৈলাসধামে বড় কাণ্ড কারখানা

হইয়া গিয়াছে। তখন ভক্ত ঋষি যোগীরা তোমার কত খেলা দেখিতেন। কোথায় গেল সে সুদিন? এক বার, হে নাথ, সে কৈলাস দেখাও। ভারত কাঁদে, বঙ্গ কাঁদে। হে জগদীশ্বর, এক বার তোমার দ্বার খুলিয়া দাও। কৈ হিমালয়ে আর হিমালয় রহিল না।—ঐ যে মা প্রকৃতি দেবী ঘরের ভিতরে বসে হাসছ। এতো পাহাড় নয়। এতো ব্রহ্মের মায়া-স্বরূপ। পাথরের ভিতর আর পাথর নাই, কেবল জ্যোতি। তোমার সুন্দর সোনার ঘর তাহার ভিতরে। ঈশা, মুষা, শ্রীগৌরাঙ্গ, সকলেতে এ ঘরে জুটেছে। হে ভক্তজননী, তুমি এই সমুদায়কে আশ্রয় দিয়া কত সুখে রাখিয়াছ! কলিকাতা, মনকে টানিও না। নীচ দেশ, মনকে কলুষিত করিও না। যেমন জ্যেষ্ঠ ভাইগুলি মার পাশে নাচিতেছিল, হায় কবে আমরা সেইরূপ ওদের সঙ্গে মিশিয়া এইরূপে নাচিব। হে ঈশ্বর, তুমি কলির মানুষকে এত ভাল বাসিলে। এই পাহাড়ে লোকে কাট কাটে, পাথর ভাঙ্গে সকলই টাকার জন্য। মা, এই পাথরের মধ্যে তুমি বসে আছ। কত শেল তোমার বক্ষে মেরেছে। মানুষ তোমার এই সুন্দর পবিত্র পর্ব্বতে এসে পাপ অধর্ম্ম কত করিতেছে। এক বার তো জিজ্ঞাসা করে না কাহার রাজ্যে এসেছে? বলে এসব সাহেবদের বাড়ী, এস্থান তাহাদের কর্ম্মের স্থান। সোণার লক্ষ্মী তুমি এই সকল পাথরের মধ্যে লুকাইয়া রহিয়াছ। তবে পৃথিবী কেন মা নাই, বাপ নাই বলিয়া বিলাপ করে? হে মা, তুমি যে আছ বজ্রধ্বনিতে তাহা এক বার প্রচার কর। এক বার বল যে এই পাহাড়ে মহাদেবের বাসস্থান। সকল দিক জ্যোতির্ম্ময়! কি আশ্চর্য্য প্রকৃতির সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্য দেখে পৃথিবী কৃতার্থ হউক! হে দেবী, একবার প্রসন্ন নয়নে আশীর্ব্বাদ কর, আর যেন কখন লালসার কুটিলতা মনকে না কলুষিত করে। এক বার যদি চারি হাজার বৎসর পরে কৈলাস দেখা দিলে তবে কথা কও যেন ভারত ভুলে যায়। হে কৃপাময়ী, এই উৎসবদিবসে আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, কৈলাসের সন্ধান পাইয়াছি, এবার হইতে মার চরণে বসে কৈলাস সম্ভোগ করিব। হে মঙ্গলময়ী, তোমার সুকোমল সুনির্ম্মল শ্রীচরণ আমাদের পাতকী সংসারপ্রিয় মস্তকের উপর স্থাপন কর। হে জননী, প্রকৃতির হাসিতে আমি চিরকাল হাসিব; প্রকৃতির স্তনের

দুঃখকে আমার প্রাণসর্ব্বস্ব করিব, যোগেতে যোগেশ্বরীর সঙ্গে এক হয়ে যাব; এবার থেকে কৈলাস ছাড়া আর হব না; আমার প্রাণের ভিতরে কৈলাস সদা হাসিবে! আমি হাতে করে মহাদেবকে সদা রাখ্‌ব; আমার বাড়ী এই কৈলাস হইবে; এই আশীর্ব্বাদ তুমি কর। আমি যে শ্মশানের ভিতর দিয়া প্রকৃতি দেবীকে লাভ করিলাম। আমি এবার থেকে আর অন্য কাহা-কেও পূজা করিব না। আমার কথাটা বিশ্বাস করে সকলে দুঃখ কষ্ট নিবা-রণের জন্য এখানে আসিবেন। ওগো দেবী, তুমি দয়া করিয়া আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর। আমরা যে যেখানে আছি সকলে প্রাণে প্রাণে মিলিত এবং এক হয়ে তোমার শ্রীচরণে বার বার ভক্তির সহিত প্রণাম করি।

সতীত্ব।

মাঘোৎসব।

১০ই মাঘ প্রাতঃকাল, ১৮০০ শক।

আমাদের ধর্ম্মে মানুষ কিছুই বলে না, কিন্তু মানুষকে মনের মানুষ বলেন। ভক্তের রসনা হইতে যাহা কিছু বাহির হয়, তাহার এক অক্ষরও ভক্তের নয়। এই শাস্ত্রই আমরা শিখিয়াছি, এই শাস্ত্রই আমরা মানি। আমা-দিগের শরীর, আমাদিগের মুখের কথা, অথচ আমাদিগের নয়। কে বক্তৃতা করে? কে উপদেশ দেয়? নরাধম সে ব্যক্তি যে মনে করে, আমিই সমস্ত করিয়া থাকি। পৃথিবীর অভিসম্পাত তাহার উপর পতিত হউক, যে আপনার বুদ্ধি হইতে পরকে উপদেশ দেয়। যখন মানুষের কথা থাকে না, তখন ঈশ্বরের কথার আরম্ভ। মানুষের গোলমাল নিস্তব্ধ হইল, মানু-ষের মুখ বন্ধ হইল, ঈশ্বরের মুখ খুলিল। যে নিজে কিছু বলে না তাহারই মুখে ঈশ্বর কথা কহেন। তাহারই রসনায় বাক্যের দেবতা বসেন, বদন কুটীরে বসিয়া নিজে নিজলীলা প্রকাশ করেন। এই জন্য নববিধানে মনুষ্যের কথার শেষ হইল; ক্রমে সকল কথাই নিস্তব্ধ হইতেছে। হউক নিস্তব্ধ; ব্রহ্মের সুর যেন তোমার কণ্ঠ হইতে বিনিঃসৃত হয়। নারদ, মুষা প্রভৃতি স্বকণ্ঠে যেমন হরি সেতার বজাইয়াছিলেন, তেমনি আমাদের কণ্ঠে

তিনি বাজান। ভক্ত কি নিজে বলেন? নিজে কি তিনি কথা কন? ভক্তকে ভক্তবৎসল বলান। তুমি কথা কও, কর্কশ গলাতে বোঝা যাইবে; মিষ্ট কণ্ঠে মিষ্ট সুরে হরির কণ্ঠ জানিতে পারা যায়। তোমার পাণ্ডিত্যের বক্তৃতা শুনিবার জন্যই কি দেশ দেশান্তর হইতে লোক আসিয়াছেন? তুমি এত লোককে পরিতুষ্ট করিবে? লোকে বলে, তোর বক্তৃতা আমরা শুনিতে চাই না। আলো জ্বালিয়া রাত্রিতে এখন তুমি শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবে? আমরা তাহা শুনিব না। ওরে ভ্রান্তজীব, আকাশে সত্য দেখ, আর বল; চারিদিকে সত্য দেখ, আর বল; এখন আর বাতির আলোর প্রয়োজন নাই। গ্রন্থের মত বলিতে হইবে না; এ সময় নববিধানের পবিত্র সময়; এ সময় ক্রমে মনুষ্যের বাক্য নিস্তব্ধ হইয়া আসিতেছে। এ সময় জলন্ত ব্রহ্মবাণীর অধিকার। আচার্য্যের এখন প্রয়োজন নাই। আচার্য্য উপাচার্য্যের ব্যবসায় বন্ধ হইতেছে। কে বক্তা, কে শ্রোতা? হরি বক্তা, হরি শ্রোতা। হরি যদি না বলান, কে বলে? হরি যদি না বোঝান, কেই বা বোঝে? তাঁর শক্তি বিনা সরলতম সত্যও কেহ উপলব্ধি করিতে পারে না; কোন সত্য কাহারও শুনিবার ক্ষমতা হয় না। হরির বলাও চাই, হরির শোনাও চাই। নিজের রসনা ফেলিয়া হরির রসনা গ্রহণ কর; নিজের কাণ ফেলিয়া দিয়া হরির কাণ পর। সুর বোধ না থাকিলে কিরূপ বলিবে? সুর বোধ না থাকিলে কিরূপে শুনিবে? ব্রহ্মসুরবোধ লইয়া নববিধানের গূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। এখনকার কথার মধ্যে মনুষ্যের কথা যে নাই এরূপ বলিতেছি না, যদি থাকে তাহা অসত্য, তাহা ভ্রান্তি। দিন আসিতেছে, মানুষের রসনাকে যন্ত্র করিয়া ঈশ্বরই কেবল জীবের কর্ণে মধু বর্ষণ করিবেন। ব্রহ্মবুদ্ধি ভিতরে থাকিয়া মানুষের বুদ্ধি উদ্দীপ্ত করিবেন, ব্রহ্মভক্তি ভিতরে থাকিয়া মনুষ্যের বোধকে কার্য্যে পরিণত করিবেন। জীব, তুমি কেবল বস। জীবের বকাবকি নিস্তব্ধ হউক। এখন হরিকেই শুনিব। আমি যদি গান শুনি, হরিকে গাওয়াইব। যদি গাইতে চাই, হরিকে শুনাইব। এখন টাট্টা? হরির কথা শুনিবার সময় মানুষের কথা? প্রদীপ? প্রাতঃকালে সূর্য্যের আলোকে আমি, আমার কাছে বাতি ধরিতে চাও? এ কি রাত্রি দুইপ্রহর? দূর হও, ক্ষুদ্র

মানুষ তুমি। বক্তাব সুরের ঘরে চাবি বন্ধ হউক; উপদেষ্টা, চলিয়া যাও আচার্য্য, চির বিদায় লও। পরমাচার্য্য এখন কথা কহিবেন। পৃথিবীর বক্তা শ্রোতা আর চাই না; স্বর্গীয় বক্তা এখন কথা কহিবেন, স্বর্গীয় শ্রোতা এখন শ্রবণ করিবেন। আমি কথা কহিব না, তুমি কথা কহিবে না; আমি শ্রবণ করিব না, তুমি শ্রবণ করিবে না। কেহ আর আপনি উপাসনা করিও না। যদি ব্রহ্ম আবির্ভূত হইয়া জিহ্বাকে উত্তেজিত করেন, তবেই উপাসনা হইবে। শ্রোতাদের মধ্যে হরি আবির্ভূত, হরি নিজে বসিয়া রহিয়াছেন। বক্তা কি এত বড়, যে নিজে কথা কহিয়া হরিকে পরিতুষ্ট করিবেন? এত সাহস তোমার? এঁরা কে? মানুষের কর্ণে হরি যে। হে পবিত্র বেদি, এ বিশ্বাস ব্যক্ত কর। বেদীই বা কি? আমি কে? এঁরাই বা কে? সকলই অসার; যন্ত্রী কেহ নয়, সমুদয় যন্ত্র। কেউ শোনে না, কেউ কথা কয় কয় না। তুমি অনধিকার চর্চ্চা কেন করিবে? তোমার আমার অনেক বুদ্ধির তৈল খরচ হইল, বেলা পর্য্যন্ত প্রদীপ জ্বলিতেছে। এখন নির্ব্বাণ হউক, পুরাণাদি বন্ধ হউক। সকাল যেমন হইল, নববিধানবাদীর প্রদীপ অমনি বন্ধ হউক। তার পর হরি বুদ্ধি দিন বক্তাকে, শুদ্ধি দিন শ্রোতাকে। ইহা হইলেই নববিধান পূর্ণ হইয়া যায়। নববিধান আসিয়াছেন; এখনও কি বক্তৃতা করিবার ইচ্ছা থাকিবে? বিদ্যার গর্ব্ব ছাড়। কেবল মোহিনী যিনি, বিদ্যা যিনি, তাঁহাকে কথা কহিতে দাও। এই সুসংবাদই প্রচার কর; বিষ ছড়াইবার চেষ্টা আর করিও না। আচার্য্য, সাবধান! বাতির আলো যেন তিনি আর না ধরেন। আপনাদিগের মনের গরল উদ্গীরণ করিয়া কেহ যেন আর সত্যলোলুপদিগের হৃদয়ে যন্ত্রণা না দেন। আচার্য্য যিনি তিনি বসিয়া থাকুন, উপদেষ্টা মৌনী হইয়া যাউন। হরি রসনাসেতারে অঙ্গুলী দিবেন, রসনাকে ঘুরাইবেন। রসনার তারে চমৎকার ব্রহ্মসংগীত নির্গত হইবে, জীবন্ত ভাগবত বাহির হইবে। শ্রোতারাও বলিবেন, এ কে? শ্রোতারা এত মোহিত কেন? চিদানন্দ ধন বুঝি শ্রোতারূপে? বক্তা প্রীত করেন শ্রোতাকে, শ্রোতা প্রীত বক্তাতে। হরি দুই দিকেরই আধার। এক দিকে আরম্ভ করেন, আর এক দিকে যান। এই ভাবে সমস্ত বলিতে

হইবে, সমস্ত শুনিতে হইবে। যেখানে বক্তা নিজে বলেন, দাঁড়াইয়া সেখানে বক্তৃতাকে কাটিবে। বলিবে, তোমার গরলপূর্ণ কথা শুনিতে আমরা আসি নাই। দুই দশ দিনের পথ অতিক্রম করিয়া আসিলাম কি মানুষের কথা শুনিবার জন্য? মানুষের কথায় পরিত্রাণ নাই। তোমার আচার্য্যবেশ ছাড়, মানুষরসনা ছাড়। দেবস্বর চড়াইয়া দেবগান আরম্ভ কর। ব্রহ্মসুরে যদি গান হয়, বক্তা বলিতে বলিতে ব্রহ্মে মোহিত হইবেন, শ্রোতা শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া যাইবেন। শব্দ যদি ব্রহ্ম হন, মুখে ব্রহ্মশব্দ উচ্চারিত হউক, কর্ণে ব্রহ্মশব্দ প্রবিষ্ট হউক। বলিতে বলিতে স্বর্গ, শুনিতে শুনিতে স্বর্গ।

এই কথা বলিয়া কোন্ কথা আরম্ভ করিব? ভগবানের প্রেম। আমরা যাহাকে ভালবাসা বলি, তাহা অনেক প্রকার আছে। উৎকৃষ্ট ভালবাসা বাহির করিতে হইবে। ভগবান্ অনেক ফুল রাখিয়াছেন। গোলাপ, জুঁই, চাঁপা, কদম্ব, পদ্মফুলে তোমার হৃদয় সাজান রহিয়াছে। ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা কর, কোন্ ফুল ভাল লাগে? কোন্ ফুল তিনি তুলিয়া লইবেন? পদ্ম না গোলাপ? জুঁই না চাঁপা? ভালবাসা কত রকম; ফুল কত রকম। চাঁপার গন্ধ গোলাপে নাই, জুঁইএর গন্ধ চামেলিতে নাই। কিন্তু প্রত্যেকটিই সুন্দর। যখন মা বলিয়া ডাকি, তখন সুখ হয়; যখন পিতা বলিয়া ডাকি তখনও সুখ হয়। কখনও আবার ভাই বলি, বন্ধু বলি, ঘর বাড়ীও বলি। যার মাটীর ঘর, খোলার চালই সর্ব্বস্ব, সে ঈশ্বরকে মাটীর ঘর খোলার চাল বলে ডেকেই সুখ লাভ করে। ছেঁড়া মাদুরে শোয় যে গরিব, সে আর কিছু বলিতে না পারিয়া বলে, তুমি আমার ছেঁড়া মাদুর। গরিব গৃহস্থ কি বলিয়া স্তব করিবে? ছেঁড়া মাদুর ছিল প্রিয় তার সংসারে। ডাকিল ঈশ্বরকে ছেঁড়া মাদুর বলিয়া। সেই স্তবের কাছে বেদ বেদান্তের স্তব ভাল লাগে না। সেই স্তব ঈশ্বরের এত ভাল লাগে যে তিনি বলিলেন, ঋক্ বেদের স্তব অপেক্ষা আমি এই স্তব পছন্দ করি। আপনার অন্ন পানে তাকাইয়া বলে, এখানে তুমি হরি। ঘরের মাটী চাল দেখিয়া বলে, এই যে মাটী চাল, এই তুমি। কেউ আবার মুক্তার মালাতেই মোহিত। রাজা যিনি, রাজকার্য্য করিতেছিলেন, মুক্তার

মালার দিকে দৃষ্টি পড়িল, শোভা সম্পদ নিরীক্ষণ করিলেন, হাসিতে হাসিতে বলিলেন মাতঃ, আমার মুক্তার মালা তুমি যে। রাজা যিনি, মার ছেলে তিনি। তিনি হাসিলেন। যার যেটি ভাল লাগে, সে সেইটিই ঈশ্বরে আরোপ করে। কাহারও একখানি ভাঙ্গা ঘর আছে, কাহার একটী ভাঙ্গা হাঁড়ি আছে ; একটু ঔষধে কাহারও হয় ত রোগ প্রতিকার হইয়াছে, একটু আগুনে কাহারও শীত নিবারিত হইয়াছে ; একটু বস্ত্রে কাহারও শীতের ক্লেশ অপনীত হইয়াছে, একটু ঠাণ্ডা জলে কাহারও তৃষ্ণা দূর হইয়াছে ; যাহার যাহাতে কিছু উপকার হইয়াছে, তাহার তাহাই স্তবের উপকরণ হইয়াছে। বড় বড় বক্তৃতা ঈশ্বরের সমক্ষে করিও না। তাঁহার সমক্ষে বক্তৃতা করার ন্যায় অন্যায়, দুষ্ট কর্ম্ম আর নাই। প্রেমের উচ্ছ্বাস যেরূপে হয়, দেখানই ভাল। ঈশ্বরকে কেউ ছেঁড়া চাল বলিতেছে, কেউ মা বলিতেছে, কেউ পিতা বলিয়া ডাকিতেছে। কেউ বা সন্তানবাৎসল্য ঈশ্বরকে অর্পণ করিতেছে, সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতেছে। কেহ, বলিতেছে হরি, তুমি এক বার খেলা কর। গাড়ী কিনে দিব, ছোট নৌকায় চড়াইব, আর ঘোড়ার উপর চড়াইয়া তোমাকে লইয়া চলিব। যা বলি মাকে, মা তাই শোনেন। কাটি ধর, কাটি ধরেন। নাচ তুমি, অমনি নাচেন। যা বলি, তাই করেন। কাগজে নৌকা প্রস্তুত করিয়া তার নিচে তৈল দিয়া পুকুরে ভাসাইয়া বলি, হরি, এ নৌকায় তুমি চড়িবে না? হরি বলেন, চড়িব বৈ কি। তিন বড় সমুদ্র ছাড়িয়া খেলা করিবার জন্য কাগজের নৌকায় চড়েন। কি নাকালই হন তিনি ভক্তের কাছে। ভক্তের কাছে তিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন, যখনই আমায় ডাকিবে তখনই আমি আসিব, যা আমায় করিতে বলিবে, আমি তাই করিব। এক জন ভক্তের বালিস ছিল না, বলিল, হে হরি, তুমি আমার বালিস। ধরিয়াছে সে কোন মতেই ছাড়িল না। মাথার কাছে রাখিল তাঁহাকে ; তাঁহার উপরে মাথা রাখিয়া শয়ন করিল। সমস্ত রাত তাঁহাকে বালিস হইয়া থাকিতে হইল। হরি কি ভক্তের মস্তক আপনা হইতে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাইবেন? কোথায় ফেলিয়া যাইবেন? হরি কি তা পারিবেন? হরি তাহা পারেন না। এমনই করিয়া ঈশ্বরকে লইয়া কত ভক্ত যে কত

খেলা করিতেছেন তাহা বলা যায় না। হরি যেন চোর দায়ে ধরা পড়িয়াছেন। ছেলেরা বলে মা বাপকে, চাঁদ ধরে দিবি না? হরিকে ভক্তেরা বলেন, চাঁদ ধরে দেবে ত দাও নতুবা আর উপাসনা করব না। ওরে ছেলে গুলো, সমস্ত রত্ন দিব, যা চাহিবে তাই দিব। চাঁদ লইবে কিরূপে? এইরূপে ঈশ্বর ভক্তকে কত বলেন। ভক্ত বলেন, আমি ও কথা শুনিব না; চাঁদ দেবে ত দাও, নতুবা আর অন্ন গ্রহণ করিব না। আগে আমি চাঁদ লইব। ঈশ্বর এক ছেলে ভুলান চাঁদ আনিয়া দেন। এত আবদারে ছেলেও জুটিয়াছে নব বিধানে। কেহ বলেন, ঈশ্বর, আমার মাঠ আছে, বাড়ী প্রস্তুত করিতে হইবে। অমুক গ্রাম হইতে দশ জন আসিবেন; অমুক গ্রাম হইতে পাঁচ জন সপরিবারে আসিবেন। আমার টাকা নাই, পয়সা নাই। কাল সকালে আমার বাড়ী চাই। লোকেরা সব আসিয়া বাস করিবেন। অলৌকিক ক্রিয়া করিয়াই হরির নাম বাড়িয়াছে। সেই রাত্রিতেই বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকিয়া বাটী প্রস্তুত করিবার আদেশ করিলেন। ভোর না হইতে হইতে সোণার অট্টালিকা প্রস্তুত হইল। ছিল মাঠ; সোণার বাড়ী কিরূপে হইল? সকলেই এই কথা বলিতে লাগিল। ভক্ত আবার বলিলেন; ঠাকুর, এত লোক আসিবেন, খাওয়াব কি তাঁদের? এটা তুমি বোঝ না? হরি বলিলেন, তোর চাল ডাল সমস্ত সংস্থানই করিয়াছি, নুন, তেল যা কিছু প্রয়োজন, সব প্রস্তুত। তোর জন্য তালুক রাখিয়াছি, তোর ছেলের ছেলে উপাসনা করিবে, তার আয়োজন করিয়াছি। তোর প্রপৌত্রের বিবাহ হইলে আমি আসিয়া কোথায় বসিব, সেই সিংহাসনেরও বায়না দিয়াছি। ভক্ত শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া পড়িলেন। যেমন ভক্তের প্রার্থনা, তেমনই হরির উত্তর। আগে প্রার্থনা ছিল, এখন কেবল তাঁর মুখ তাকিয়ে থাকা। যাহা কিছু প্রয়োজন, হরি নিজেই সমস্ত প্রদান করিবেন। হরিকে লইয়া কত রকম খেলাই হইল, বাপ মা বলা হইল, সমস্ত ফুলই দেওয়া হইল। কত ফুল বৎসর বৎসর ভক্তেরা দিয়াছেন। জুঁই, চামেলি প্রভৃতি নানা ফুলের মালা গাঁথিয়াও দেওয়া হইয়াছে। এ সমস্ত ত জানি; কিন্তু এবার কোন্ ফুল দিতে হইবে? এবার এ কি? এমন ফুল বুঝি চাই, যাহা আমাদিগের ডালিতে নাই? কোন ফুল ভুল হইয়াছে বুঝি? বাগানে এমন ফুল আছে

কি যাহা আনিতে ভুলিয়াছি? আমাদের বাগানে নাই, অন্যের বাগানে আছে, এমন কোন ফুল বোধ হয় আনা হয় নাই। বাগানে পাওয়া যায় এমন কোন ফুলের নাম শুনিয়াছি অথচ বুঝি আনিতে পারি নাই? ঈশ্বর যে আমাদের ফুল ছুঁলেন না। আজ দেখ্‌ছি উৎসব বন্ধ হয়। এত পছন্দ করিয়া তোড়া বাঁধিলাম, কৈ হরি তো আমার ফুলের তোড়া হাতে করে লই-লেন না। ভক্তেরা সব স্তম্ভিত। ইনি ওঁর কাণে বলেন, উনি এঁর কাণে বলেন, আজ মা কেন এমন অপ্রসন্না হইলেন? কোন গুরুতর অপরাধ হই-আছে বুঝি? ফুলে কোন রূপ দুর্গন্ধ ত নাই? বাসি ফুল ত নয়? উদ্যানের ফুল না দিয়া বাজারের খারাপ ফুল ত আনি নাই? মা বল, মা বল, কেহই এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করে না। ভাবুকের প্রতি আজ্ঞা আছে, ইসারায় বুঝিয়া লইতে হবে। ভাবুকের ভাবের ঘরে চুরি হইল। ভাব হে ভাবুক, কি ফুল তোমার ডালিতে নাই? সতীত্ব ফুল। ভাবের ভাবুক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন ডালিতে সতীত্ব ফুলের অভাব শুনিয়া। পিতা ভাবে, মাতা ভাবে, বন্ধু ভাবে, পুত্র ভাবে, প্রিয় বস্তু ভাবে, সকল ভাবেই সম্বোধন করা হইয়াছে; কিন্তু সতীর ভাব ব্রাহ্মেরা এখনও দিতে পারেন নাই। মা কি সহজে বিষণ্ণ? সুন্দর সুন্দর ফুল আমরা আনিয়াছি, তিনি প্রেমরসে রসাভিষিক্ত হইয়া লইতেছেন না কি সহজে? রসবিহীন ফুল কি তিনি স্পর্শ করিবেন? পুরুষ না নারী তোমরা? পুরুষ। ভগবতী চলিয়া গেলেন। দ্বার বন্ধ হইল। ফুলগুলি আকাশে উড়িয়া গেল; কতক পথে, কতক সমুদ্রে। উপাসকেরা হাঁ করিয়া বসিয়া। একেবারে স্বর্গের দ্বার বন্ধ হইল। কি জন্য? নারী ভিন্ন আর কেহ ব্রহ্মের দ্বারে প্রবেশ করিতে পারে না। যত ক্ষণ না নারী হইয়া সতীত্ব ফুল লইয়া ব্রহ্মের দ্বারে যাওয়া যায়, তত ক্ষণ কেহই গৃহীত হয় না। বেল জুঁই দিয়াছ, আমরাও দিয়াছি। নব বিধানে ঈশ্বর এবার এই ফুল চাহিতেছেন, অতএব সতীত্ব ফুল যেখানে পাও আন। কাহার বাগানে স্বামীর প্রতি অব্যভিচারী প্রণয়ফুল ফুটিয়াছে? যে প্রণয় পতি ভিন্ন আর কিছু চায় না, যে প্রণয় পতির নামই কেবল উচ্চারণ করিতে চায়, যে প্রণয়ে পতিতেই কেবল মোক্ষ জ্ঞান হয়, সে প্রণয় কোথায়? কলি-কাতায় সে ফুল নাই, হিমালয়ে নাই, বৃন্দাবনেও নাই; কিন্তু নব বৃন্দাবনে

আছে। নববসন্তসমাগমে সে ফুল ফুটিয়াছে; যাও সেখানে সে ফুল আন। নতুবা দ্বার বন্ধ; রেল পথে যাও, অশ্বারোহণে যাও, জলপথে কি স্থলপথে, যে পথে হয় যাও। সুলক্ষণাক্রান্ত হইয়া যাও, ফুল আনয়ন কর, বিপদ্দভঞ্জন হরি দ্বার খুলিবেন। দয়া করিয়া আবার দ্বার উন্মোচন করিবেন। পলকের মধ্যে ফুল আনিতে হইবে। এক মিনিটের মধ্যে রামায়ণ মহাভারতেরও ব্যাপার শেষ হইবে। পুরুষেতে সতীত্ব, যেমন শুনিবে লক্ষ লক্ষ লোক অমনি মস্তক ছেদন করিতে চেষ্টা করিবে। পৃথিবীর রাজার বিচারে সতীত্বফুলে পুরুষের অধিকার নাই। সতীত্ব পুরুষ! বা রে! কি ভয়ানক কথা! পুরুষ পতিকে লইয়া আসিবে, পুরুষধর্ম্মের ব্যাকরণে ইহা ভ্রান্তি। বুদ্ধিমানেরা উপহাস করিবে। যাহারা পতিতে সন্তুষ্ট নয়, তাহারা খড়্গ লইয়া তোমাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য পথে প্রতীক্ষা করিবে। পুষ্পস্পৃহা যাহার বলবতী খড়্গহস্তে দৌড়িল সে ব্যক্তি। সম্মুখস্থ যুদ্ধে যাহারা আসিল তাহারা সব পরাস্ত হইয়া চলিয়া গেল। সতীত্বফুল নববৃন্দাবনে ঢাকা আছে। পাহাড় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল, সতীত্ব-কুসুম লাভ করিল। কি মজার জিনিষ! এমন জিনিষ চক্ষু দেখে নাই, এমন বস্তুর কথা কর্ণ আর শ্রবণ করে নাই, এমন শ্রী মন আর ভাবিতে পারে না। শ্রীবৃন্দাবনের সদ্যোজাত সতীত্বফুল লইয়া ফিরিল। আবার উৎসবের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। ঠিক যেন মধ্যে একটি গল্প হইয়া গেল। ঈশ্বরের নিকট পতিপ্রিয় সতীর ন্যায় যাইতে হইবে। ব্রহ্মাণ্ডপতিই পতি। তিনি ভক্তের পতি। সতীত্বের ন্যায় অধিক ভালবাসার কি আর আছে। পিতার ভালবাসা, ভাইবন্ধুর ভালবাসা উৎকৃষ্ট। কিন্তু উৎকৃষ্টতর আসিলে উৎকৃষ্টও নিকৃষ্ট হইয়া যায়। পিতৃভক্তি মাতৃভক্তি সকলই ঈশ্বরকে দেওয়া হইয়াছে। এবার সতীর প্রেম দিতে হইবে। সতীর প্রেমের ন্যায় আর প্রেম নাই। এই শাস্ত্র অভ্রান্ত উৎকৃষ্ট শাস্ত্র। সতীর সতীত্ব লালফুল। কত চিত্রবিচিত্র করা। তাহাতে পিতৃভক্তি বন্ধুর প্রণয় ভ্রাতৃস্নেহ এ সকল তাহার মধ্যে আছে। ইহা যেন একটি নূতন ফুল। ইহা প্রণয়পূর্ণ। স্বামীই সতীর সর্ব্বস্ব। নিরাশ্রয় অবস্থায় সতী কন্যারূপে স্বামীর সেবা করেন; কখন ভগিনী ভাবে পতীর মুখপানে চাহিয়া হাস্য করেন। কোন ভাবই সতীত্ব

ভাব হইতে ছাড়া নয়। একটি ফুল পরিত্যাগ করিয়া সতী আর একটি ফুল লন না। তুলসী ছাড়িয়া তিনি জবা গ্রহণ করেন না। উদ্যানে যখন সতী প্রবেশ করেন, সকল ফুলের উপরেই সতীর হস্ত পতিত হয়। ভাই ভগিনীকে খেলা করিতে দেখিলে সতী ভাবেন, আমরা কেন এইরূপে খেলা করিব না। স্বামী স্ত্রীতে মিলিয়া ভাই ভগিনীর মুখ কেন লাভ করিব না? আমরা কি ভাই ভগিনী নই? সেই সম্বন্ধত ঘুচে নাই। বিবাহ হইলে সেই সম্বন্ধ আরও প্রগাঢ় হয়। সতী স্বামীকে ভাই ভাবে ফোটা দিতেও পারেন। আবার যখন স্বামী শয্যাতে শয়ান, উঠিবার সামর্থ্য নাই, রোগে জর্জ্জরিত, মাতার ন্যায় গম্ভীর ভাবে শুশ্রূষা করিতে স্ত্রীর ন্যায় আর কেহ নাই। স্বামীর তখন মা বাপ ভাই বন্ধু যা বল সবই এক জন। টাকা স্ত্রীর হস্তগত, পাইয়াছেন স্বামীর কাছে; এবার স্বামীকে দিবার সময়। ভাল বেদানা কোথায়, মিশ্রী কোথায়, স্ত্রী কেবল এই বলেন। স্বামীর জন্য স্ত্রী মাতার কার্য্য করেন। স্বামী যিনি, তিনি এখন কেবল স্ত্রীর হৃদয়ে দয়া উদ্দীপন করিতেছেন, তাঁহার মহত্ত্ব ঘুচিয়াছে। বিদ্যা বুদ্ধি এখন কোন কাজেই আসিতেছে না। খাওয়াইলে তিনি খান, উঠাইলে তিনি উঠেন। সতীর প্রেম কি সুন্দর! স্বামীর হাত নাই, কোন কাজ করিতে পারেন না; সতী আপনার হাত দিলেন। উনি শুনিতে পাইতে-ছেন না, সতী নিজে কর্ণ হইয়া শুনান। মন হয়ে কত ভাল ভাল বিষয় ভাবান। আর মার কর্ম্ম বাকী কি বল? অধিক বয়সের স্ত্রীর অর্থই মাতৃতুল্য। সমস্ত দিবস পরিশ্রম করিয়া পাঁচটা পর্য্যন্ত কার্য্যালয়ে কার্য্য করিয়া স্বামী গৃহে আসিলেন, গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা সতী গাত্রে হাত বুলা-ইয়া দিতে লাগিলেন। এমন পতিমর্য্যাদা কে জানে? কে আর এমন পতির সেবা করে? সতী যে এ সব কার্য্য করেন টাকার লোভে, না দশ জন লোকে তাঁহার নামে কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রস্তুত করিবে বলিয়া? পাড়ার লোকের সুখ্যাতির জন্য কি সতী পতিসেবায় ব্যস্ত হন? না, পতি যে তাঁহার সর্ব্বস্ব, পতিই তাঁহার ভাল লাগে। পতির যাহা কিছু তাহাই তাঁহার নিকট সুন্দর ও মিষ্ট। সারেঙ্গের সুর, এস্রাজ বাজানও সতী শুনি-য়াছেন, কিন্তু স্বামীর কণ্ঠের নিকট সে শব্দও তাঁহার মিষ্ট বোধ হয় না।

কোকিলেরও প্রাধান্য হইল না সতীর কাছে। পতির কণ্ঠের স্বরকে সতী সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট বলেন। সতী কেন এমন বলেন? অলঙ্কার শাস্ত্রের অত্যুক্তির পরিচ্ছেদ বুঝি সতী ভাল করিয়া পাঠ করিয়াছেন। সতীর কাছে এ সব অত্যুক্তি নয়। সতী জানেন, যথার্থ বিদ্যা তাঁহার পতিই জানেন। স্ত্রীর নিকট যদি স্বামী অবস্থান করেন, যদি স্বামী গৃহরক্ষায় নিপুণ হন, তাহা হইলেই তিনি সতীর নিকটে বিদ্বান্। স্বামী যে বেদ জানেন না সে জন্য সতী তাঁহাকে মূর্খ বলেন না। সেই নির্ব্বোধই সতীর সুবোধ। স্বামীর মুখের কথা সতীর এত ভাল লাগে যে বেদ না শুনিয়া সতী কেবল তাহাই শ্রবণ করেন। স্বামীর মুখ যে কাল, মলিন, স্বামী যে রোগে শীর্ণ, সতীর তবুও সুন্দর বোধ হয়। তিনি বলেন গোলাপও এমন সুন্দর নয়। স্বামী ফুলের মত কোন ফুলই নয়। সতী যে এরূপ কথা বলেন, কে শিখায় তাঁকে? ব্রহ্ম না শিখাইলে তিনি কেমন করিয়া বলেন? পাগলিনি, আমরা যে দেখিয়াছি, পরীক্ষা করিয়াছি, তোমার স্বামী আকৃতিবিহীন রূপবিহীন, তুমি নির্ব্বোধের ন্যায় এমন উক্তি কেন করিতেছ? সতী আকাশের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, আমার কাছে আমার স্বামীর রূপ গুণ আছে। সতীর স্বামীই সর্ব্বস্ব। যেমন ঈশ্বর অতুল নিরুপম, ঠিক স্বামী পত্নীর পক্ষে সেইরূপ। সতীর যেমন দ্বিতীয় পতি থাকিতে পারে না, ব্রহ্মভক্ত তেমনই বলিতে পারেন না যে জগৎপতি আর এক জন আছেন। অন্য পতি আছে বলিলে তাঁহার গলা কাটা হয়। সতী পত্নী বলেন, অন্য স্বামী কি? আমার স্বামীর পদ মুছাইব আমি কাপড়ের অঞ্চলে। আমার মোক্ষ মুক্তি এই পতিসেবাতে। যে ফুলে প্রাণপতি মোহিত হন সতী সেই ফুলই অন্বেষণ করেন। সতী যে চেষ্টা করিয়া পতিমর্য্যাদা শিখিয়াছেন তাহা নহে। আপনিই আপনার সরস্বতী। ব্রহ্মপতি যাঁহার পতি, তাঁহারও তেমনি। পতি ভিন্ন আর তাঁহার কিছুই ভাল লাগে না। লজ্জায় তিনি সুশোভিত। লজ্জাই তাঁহার মুখের লাবণ্য। ব্রহ্মকে পাইলে তিনি বলেন জীবনের সাধ মিটাইয়া এখানে আসিয়া প্রাণপতিকে পাইলাম। ব্রহ্মই প্রাণপতি ব্যাকরণের কিছুই ভুল নাই। কি বেদ বেদান্ত কি শিখধর্ম্ম কি ইংরাজধর্ম্ম সকলই

তাঁহাকে পতি বলিয়া থাকেন। জগৎপতি স্বর্গপতি তিনি যদি সাধারণ ভাবে পতি হন, তবে এক এক জনের পতি না হইবেন কেন? আমি কি এমনি কুলটা যে আমি তাঁহাকে পতি বলিব না? সকলের পতি হইবেন তিনি, কেবল আমিই বাদ পড়িব? তিনি জগতের পতি, কেবল কি আমারই পতি নন? এই পথে ব্যাভিচার কণ্টক। অন্য কণ্টক নাই, জ্ঞান চাই না। পতিভক্তি থাকিলে পতি কাছে আসিতে দিবেন। মানুষ পতির ন্যায় তিনি নন, নিরাকার পতি ব্রহ্মপতি। আমি বালিকা পত্নীর মত তাঁহার পানে চাহিব। সতী দাসী হইয়া আমি তাঁহার কাছে থাকিব। আমি তাঁহার পদার্চ্চনা করিব। আমার ধনপতি সংসারপতি বন্ধুপতি ছিল। সকলে হাত ধরিয়া রাস্তার কাঙ্গাল করিয়া বসাইল। এখন সতীপতি অর্চ্চনা না করিয়া আসল পতি ব্রহ্মপতির শরণাগত হইব। ধন মান কি তোর স্বামী হইতে পারে? রে অবোধ মন, তোর পতি খোঁজ। খুঁজিয়া পতিকে বাহির কর। আমাদের কি অন্য পতি ছিল না? তোমরা মনে করিয়াছিলে কলঙ্কের হাত এড়াইবে। তুমি জান না যে টাকাকে পার্শ্বে বসাইয়া তুমি সেবা করিয়াছ। ব্যভিচারিণি, পলায়ন কর। পুরুষ বলিয়া কি ক্ষমা পাইবে? পুরুষের শরীর পাইয়াছ বলিয়া কি কলঙ্কের ভাগী হইবে না? আমাদের পতি ঘরে রহিয়াছেন, কল্পনা করিয়া কেন তুই পতি প্রস্তুত করিস্? কে তোর পতি? কারে বলিস পতি? জগৎপতি যে তোর স্বামী। ঐশ্বর্য্যশালী যিনি, যাঁহাকে দেখিয়া মন মোহিত হয়, তিনি যে কাঙ্গালিনীর পতি। তিনি আপনি বলিয়াছেন, আমি কাঙ্গালিনীর পতি। এই ছেঁড়া কাপড় যার, কাঙ্গালিনী যে, সে আমার স্ত্রী। হায় জীব! তুই কি করিলি? প্রেমকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কেন পাঁচ হাতে দিলি? ওরে যা দেখিস্ তাইতে মুগ্ধ হইস্? খাবি যদি তবে খাদ্যেই মুগ্ধ হইস্? পুস্তকে মুগ্ধ হইস্? অবিদ্যাতে মজিস্? হায় রে! তোর ভগবান্ পতিকে ছাড়িলি। যার এমন মনোহর লাবণ্য তাকে ফেলে দিলি? এই যে ভয়ানক পৌত্তলিকতা। সংসারপতির নিকট কাঁদিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলি। ভগবান্‌পতি সকলই শ্রবণ করিতেছেন। যেন আমাদের পতি নাই এই ভাবে আর পরের কাছে যাইব না। অবলাকে আশ্রয় দাও, অবলাকে আশ্রয় দাও বলে

আর কাহারও দ্বারে দাঁড়াইব না। প্রেমের ভাবে কেবল এক পতিকেই দেখিব। আর যেন কিছুই নাই। যা ভাল বাসিব পতিকে, পতিকে ভাল বাসাতেই পতির জিনিসে ভালবাসা। পতি গোলাপকে ছুঁয়েছেন তাই আমার গোলাপ ভাল লাগে। গোলাপ বুকে রাখিলে আমার হৃদয়ের শোক চলিয়া যায়। কেননা আমার পতি যে গোলাপকে স্পর্শ করিয়াছেন। আমার পতি চাঁদকে আপনি স্পর্শ করিয়াছেন। তাই চাঁদ হয়েছে প্রিয়, পতি চাঁদের জন্য। আমার পতি নদীর উপর তাই নদীর শোভা ভাল লাগে। আমার পতি আকাশে সেই জন্যই আমার আকাশ দেখিতে ভাল লাগে। আমি যে আমার পতির দাসী। আমি আর স্তব করিব কি? বেদ বেদান্ত ছেড়ে, ভাগবত ছেড়ে পতিকে চেনাই আমার সার জ্ঞান। পতি কি সামান্য ধন? পতি সেবাতেই জীবন কাটিয়া যা'ক। পৃথিবীতে আসা এজন্য যে শুষ্ক পতির এক বিন্দু পদরেণু লইয়া এই পৃথিবীতে কৃতার্থ হইব। সাবিত্রীব্রত ধরিয়া সত্যবতী সতী হইব, কেননা সত্যবান্ পতিকে লইতে হইবে। আমি কার ঘর পরিষ্কার করি? কার ঘরে পরিশ্রম করি? পতির বাড়ী না হইলে আমি স্পর্শও করি না। আমার পতির খোলার ঘর হউক না, দাসীর জীবন সেই ঘরেই পতি সেবা করিয়া পবিত্র ও কৃতার্থ হইবে। পতির ঘর যেরূপই হউক সতী দাসী তাই সাজাইবে। কাঙ্গালিনীর পতিই সার। পতি যা বলিবেন তাই মিষ্ট। গানবিদ্যা সমস্ত একত্র করিলেও পতির স্বর সতীর কাছে মিষ্ট বোধ হয়। সতীর আর কিছু তদপেক্ষা ভাল লাগে না। সতী বলেন পতির কাছে যাইব, পতির কথা শুনিব। কাঠ কুড়নীকে জগৎপতি স্বর্গপতি কি কাছে যাইতে দিবেন? বলিব, পতি, উপযুক্ত কি হইয়াছি? ছুঁবে না কি কাঙ্গালিনীর ডালি? পতি বলেন, আর কিছু চাই না; কেবল তোর চক্ষু আমার পানে থাকুক। তোমরাও ত জান স্ত্রী যদি খুব পরিশ্রম করে তাহা হইলেই কি স্বামী তুষ্ট হন? সতীর প্রেমই স্বামীর পক্ষে শ্রেষ্ঠ। পতি আশীর্ব্বাদ করেন সতীকে "তোমার কুশল হউক"। সতী বলেন লোকে জানে একটী গোলোক আছে একটী স্বর্গ আছে, একটী বৈকুণ্ঠ আছে, পতির হাস্যবদনই আমার সেই

স্বর্গ, সেই বৈকুণ্ঠ, সেই সমস্ত। ব্রহ্মপতিকে সতীর প্রেম দাও, চক্ষু দেখিয়াই তিনি বুঝিবেন প্রেম আছে কি না। অব্যভিচারী প্রেম যদি চক্ষে থাকে ঈশ্বর বলিবেন, ঐ খানে বস। আমার কাছে আসন গ্রহণ কর। তোমার নববিধান সাধনের সুযোগ হইবে। তপস্যা করিতে হইবে না। সতীত্ব ফুল লইয়া বস, ছোট ছোট রমণীর ন্যায় তাঁর কাছে যাও। সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হইবে। এক পতিকে সমস্ত টাকা কড়ি বলিয়া জানা, ইহলোক পরলোক বলিয়া জানা, ইহা কেবল সতীই জানেন। পুরুষদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, হে ঈশ্বর, যেন সকলে সতীর প্রেম তোমায় অর্পণ করিতে পারেন। আর কিছুই ভাল লাগে না। আগে বলিতাম বেদ থেকে উপদেশ লও, পুরাণ হইতে উপদেশ গ্রহণ কর। ঈশার বিবেক লও, অমুকের ভক্তি লও, পাঁচটী ফুল তোল। ভাল করিয়া মালা গাঁথিয়া পর। প্রেমের মত্ততার ভালবাসার ভিতরে পাঁচ নাই। দ্বিতীয় তৃতীয় নাই। পৃথিবীতে গুরু নাই, ভাই ভগিনী নাই। জগৎপতিই সমস্ত। পতিফুলই প্রিয় ফুল। সতীর কাছে পতির বাড়ীর ভাঙ্গা জানালাটীও ভাল। পতির বাড়ীর লোক তোমরা পতিকে না চিনিলে তোমাদিগকে কিরূপে চিনিব? জগৎপতি যদি প্রিয় নহেন, তোমরা প্রিয় হইবে কিরূপে? পতি ঘর বাঁধিয়াছেন, পতির হাতের রচনা তোমরা। পতিকে সর্ব্বদা দেখিতে পাই না মূঢ়মতি আমি; এই সকল মানুষ করিয়াছেন তিনি, দেখিয়া সুখী হই। এঁদের ভালবাসিয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে পারি না। তাঁহাকে ভালবাসি বলিয়াই এঁদের ভালবাসা। পতি যাহাতে বিরক্ত না হন তাহাই আমার কার্য্য। তাঁর যত কুটুম্ব সব আমার কুটুম্ব। পতির জীব আমার প্রিয়। যত ভক্ত সতার ন্যায় ব্রহ্মপতির চরণে প্রণাম করেন। কাহারও পানে আর তাকান না। যার মুখে পতির ছাঁচ, পতির হাসি, পতির অধিকার, সতী তাহাকে দেখিয়াই সুখী। লোকে মনে করে আমি সুবিদ্বান্ মহর্ষি প্রভৃতির মুখ দেখিয়া সুখী হই, তাঁহাদের নমস্কার করি। তাঁদের দেখে সুখী হইব? আবার ঋষিপ্রেম? পতিকেই দেখিতেছি। মানুষ আর মানুষ নহে। জীবে ব্রহ্ম অবতীর্ণ। নদ নদী গাছ পালা সমস্ত পদার্থেই আমার ব্রহ্মপতি। তাই সকলের সৌন্দর্য্য। এই সৌন্দর্য্য দেখিয়া এবার সুন্দর হইব। ছিলাম উদাসীন, এবার গৃহস্থ হব। এবার সপরিবারে

গৃহধর্ম্ম সাধন করিব। সকলে মিলিয়া সতীত্বধর্ম্ম পালন করিব। এবারকার উৎসব সতীদিগের উৎসব হউক। পতির মুখ দেখিয়াছি বলিয়া সকলে পাগল হইয়া যাও। আপনার আত্মাকে সুন্দর কর। পতির পদ ধারণ করিয়া সকল দুঃখ সন্তাপ নিবারণ কর।

পূর্ণধর্ম্ম ভবিষ্যতে।

৮ ই বৈশাখ, ১৮০১ শক।

ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্ম সূর্য্যের প্রখর কিরণ বিস্তার করিবে। এক দিকে রাখ ক্ষুদ্রবীজ, অপর দিকে রাখ সেই বীজ হইতে উৎপন্ন প্রকাণ্ড বৃক্ষ। এখনকার ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই বীজ, ভবিষ্যতের ফলপুষ্পে সুশোভিত ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষ। এখনকার ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে কি দশ সহস্র বৎসর পরে যে ব্রাহ্মধর্ম্ম হইবে তাহার তুলনা হইতে পারে? এখনকার সত্য প্রস্ফুটিত সত্য নহে। পূর্ণ প্রস্ফুটিত সৌরভ ও লাবণ্যযুক্ত পুষ্প ভবিষ্যতে দেখিব। সেই পূর্ণ ব্রাহ্মধর্ম্ম লাভ করিলে বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মকে ক্ষুদ্র মনে হইবে। প্রকাণ্ড জলপ্লাবনের ন্যায় যখন এই ব্রাহ্মধর্ম্ম সমস্ত পৃথিবীকে আচ্ছাদন করিবে, যখন এই ধর্ম্ম সকলের ঘরে অমৃত আনিয়া উপস্থিত করিবে, তখনকার বিষয় ভাবিলেও মনে আনন্দ হয়। এখন যাহাকে আমরা ভক্তি বলি, তাহা কি ভক্তি? এখন যাহাকে আমার যোগ বলি, তাহা কি যোগ? অবশ্যই ভূতকালের তুলনায় এখন অনেক উন্নতি হইয়াছে; কিন্তু ইহার সঙ্গে কি ভবিষ্যতের উন্নতির তুলনা হইতে পারে? যাহার মধ্যে পাঁচ সাতটী সত্য আছে তাহাকে কি আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিব? এই জন্য ইহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলি যে এই বীজ হইতে প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে। এই ধর্ম্ম পৃথিবীর প্রত্যেক ধর্ম্ম হইতে এমন সকল গূঢ় সত্য উদ্ভাবন করিবে যে তদ্দ্বারা প্রত্যেক ধর্ম্মের প্রাণ বাহির করিয়া লইবে। ইহা প্রত্যেক ধর্ম্মের পবিত্র নিঃশ্বাস বাহির করিয়া লইবে। এখন আমরা বঙ্গদেশে বদ্ধ হইয়া বসিয়া আছি; কিন্তু আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক। সকল ধর্ম্মের ভিতরে ব্রাহ্মধর্ম্মের অঙ্কুর দেখিতেছি। পৃথিবীতে যে সকল ধর্ম্ম অন্য অন্য নামে পরিচিত

হইতেছে সে সমস্ত ধর্ম্মে আমাদেরই ধর্ম্মের সত্য রহিয়াছে। সে সকল ধর্ম্ম একদিন ব্রাহ্মধর্ম্মের আকার গ্রহণ করিবে, সকল ধর্ম্ম এক স্থানে আসিয়া একত্র হইবে। প্রত্যেক জাতি আপনার ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সেই ধর্ম্ম হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম উদ্ভাবন করিবে। এক স্থানে সকল জাতি একত্র হইয়া দলবদ্ধ হইবে। যতক্ষণ প্রাতঃকাল ততক্ষণ প্রাতঃকালের আদর; কিন্তু যখন সূর্য্য দ্বিপ্রহরের পূর্ণ আলোক বিস্তার করে তখন আর প্রাতঃকালের আদর কোথায়? ব্রাহ্মধর্ম্মের এখন প্রাতঃকাল। এখনও ব্রাহ্মদিগের ভক্তি প্রধান ভক্তদিগের প্রগল্‌ভা অবস্থা লাভ করে নাই, এখনও ব্রাহ্মদিগের যোগ শ্রেষ্ঠ যোগীদিগের প্রগাঢ়তা লাভ করিতে পারে নাই। এখনও ব্রাহ্মদিগের চরিত্র যথার্থ কর্ম্মচারিদিগের নিকট নিকৃষ্ট। ভবিষ্যতের প্রকাণ্ড যোগীদিগের সঙ্গে কি এখনকার যোগীদিগের তুলনা হয়? এখনকার ভক্তদিগের দুই পাঁচ ফোটা অশ্রু কি ভবিষ্যতের ভক্তদিগের নিকট ভক্তি বলিয়া গণ্য হইবে? পৃথিবীতে ভবিষ্যতে যে সকল যোগী ভক্ত আসিবেন তাঁহাদিগের নিকট বর্ত্তমান ব্রাহ্মেরা দাঁড়াইতে পারিবেন না। ব্রাহ্ম, তুমি লজ্জিত হও। তুমি যদি বল ব্রাহ্মধর্ম্ম শেষ হইয়াছে তবে তুমি যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম কি তাহা জান না। তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা ভবিষ্যতে আসিবেন, ছোট ভ্রাতাদিগের পূর্ব্বে জন্ম হইয়াছে। বিপরীত কথা! কিন্তু ইহাই সত্য কথা। শ্রেষ্ঠতর ব্রাহ্মেরা ভবিষ্যতে আসিবেন। ক্রমে ক্রমে শ্রেষ্ঠতম বৃদ্ধেরা আরও পরে আসিবেন। তোমাদের পিতা, পিতামহ প্রভৃতি ভবিষ্যতে আসিতেছেন। তোমরা হয়ত মনে করিতেছ, আমরা আগে চলিয়া যাইব, ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা আমাদের মতে চলিবে। ইহা তোমাদের ভ্রম। ভবিষ্যৎ ব্রাহ্মদিগের যোগেতে, ভক্তিতে, পবিত্রতাতে পৃথিবী টলমল করিবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের আসল গূঢ় তত্ত্ব সকল এখনও আমাদের নিকট আসে নাই। ভূতকালের দিকে তাকাইব না। ভবিষ্যতের পূর্ণ ব্রাহ্মধর্ম্ম আপনার মহিমান্বিত সিংহাসনে বসিয়া আছেন। যথা সময়ে ঈশ্বরের আদেশে তিনি আমাদের নিকট প্রকাশিত হইবেন। আকাশে এমন সকল নক্ষত্র আছে যাহার জ্যোতি পৃথিবীতে এখন পর্য্যন্ত